ধ্রুব নীলের রম্য

সায়েন্স ফিকশন

অ্যান্ড্রোমিডার মশা

উৎসর্গ

আজকাল নাকি লোকে বইটই কেনে না। আপনি সেটা ভুল প্রমাণ করেছেন বা করতে চলেছেন।

তো বইটা আপনাকে ছাড়া আর কাকে উৎসর্গ করবো!

একটা কথা

বইটি বিনামূল্যে পাঠকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। তবে বইটি ভালো লাগার পর চাইলে একটি বিশেষ তহবিলে অনুদান পাঠাতে পারেন। আপনার পাঠানো ১০ কিংবা ২০ টাকায় কেনা হবে ফলগাছের চারা। সেটা আবার বিনামূল্যেই বিতরণ করা হবে বৃক্ষপ্রেমীদের কাছে।

অনুদান পাঠানোর বিকাশ নম্বরঃ 01976-324725

সূচি

- আকালুর এক দিন
- মতিনের স্থান-কাল
- বিজ্ঞানী বজলু ও সুপারম্যান-৫৩
- অ্যান্ড্রোমিডার মশা
- বিজ্ঞানী মতিনের মহা আবিষ্কার
- বৃষ্টিবিলাস ২১১৫
- ঢাকায় পতন
- দূর আষাঢ়ের গল্প
- এক শ বছর আগের সায়েন্স ফিকশন
- জলে ঢাকা ঢাকা
- মহাবিশ্বকাপে মহাত্রাস
- নিহিরুদের সময়
- অবাক চাঁদ দেখা
- সুখি মানব
- তোমাদের জন্য রাজনীতি
- পৃথিবীর কোড
- ভার্চুয়ালে বিপদ
- বাণিজ্যমেলা ’১৮

- সেদিন রামপালে যা ঘটেছিল
- ভবিষ্যতের রাশিফল
- বিজ্ঞানী বজলুর খচখচানি
- সায়েন্স ফিকশন রূপকথা : সিপিসি ও রাখাল বালকের গল্প
- ভিরু ও পিকুর উপহারদ্বয়
- বৈশাখ ২০১৯

এবং দুটি বোনাস

- দবিরউদ্দিন ও থ্রিডি সিনেমা
- ভালবাসা বিষয়ক গরুর রচনা

আকালুর এক দিন

মধ্যবয়সী অবিবাহিত বিজ্ঞানী আকালু সবে তার সকালের নাশতায় কামড় দিয়েছেন, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এলেন তার একমাত্র সহকর্মী ড. নিনিনি। বয়সে আকালুর সমান। এখনও বিয়ে করেননি। মহাকাশযান চৈতালীতে আকালু একমাত্র পুরুষ আর নিনিনি একমাত্র নারী। জীবনের দীর্ঘ সময় দুজন একসঙ্গে মহাকাশযানেই কাটিয়েছেন। ছুটে এসে বাচ্চাদের মতো মাথা চাপড়ে নিনিনি যা বললেন তাতে খানিকটা বিরক্তই হলেন বিজ্ঞানী আকালু।

‘ড. আকালু! মহাবিপদে পড়েছি! আমাকে বাঁচাও! আমার ব্রেনবুক আবারও হ্যাক হয়েছে। কারা জানি উল্টাপাল্টা বার্তা পাঠাচ্ছে। উফফ...এ খাঁচা ভাঙব আমি কেমন করে! এ খাঁচা ভাঙব...উফফ কী সব গাইছি বলো তো? এটা নিশ্চয়ই হ্যাকারদের কাণ্ড! কী অদ্ভুত গান রে বাবা! এ খাঁচা ভাঙব... ।’

‘হ, বুঝসি। উল্টাসিধা চিন্তা করছিলা হয়তো, এ জন্য ভাইরাস ঢুকসে। হ্যাকারদের কাম। এই যে আমারে দেখো, ব্রেইনবুক-ট্রেইনবুক কোনো অ্যাকাউন্ট নাইক্কা, ঝামেলাও নাইক্কা।’

আকালুর কথায় কান না দিয়ে তিড়িংবিড়িং করে বিশ্রামকক্ষের দিকে ছুট লাগালেন নিনিনি। এ টাইপ ভাইরাস থেকে বাঁচতে ঘুমাতেই হবে। ঘুমের মধ্যে টেকনিশিয়ান রোবট এসে ব্রেনবুক রিস্টার্ট দিয়ে দেবে।

বিজ্ঞানী আকালুর চিন্তায় খেলা করছে অন্য কিছু। সেই চিন্তা জানার কিংবা হ্যাক করার সুযোগ নেই কারো। সরকারি চাকরি করলেও সরকারের কাজ কারবার নিয়ে খুব একটা ভাবেন না। ভাবলেও কিছু যায়-আসে না। কারণ তার পকেটে সব সময়ই একটা চিন্তা-জ্যামার থাকে। মস্তিষ্কে সরকারের নজরদারি ঠেকানোর মোক্ষম যন্ত্র! ইদানীংকার খবর দেখেই যন্ত্রটা বানিয়েছেন আকালু।

গতকালই ঢাকা পশ্চিমের ক ব্লকের একটা চেংড়ামতোন ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সে নাকি মনে মনে সরকারকে গালি দিচ্ছিল। ব্রেনবুক অ্যাকাউন্টে তার চিন্তা ধরে ফেলে সরকারের বিশেষ টেকনো-গোয়েন্দা বাহিনী। সরকারের এক মন্ত্রী আবার বড় বড় গলায় বলল, এ দেশের সবার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু উল্টাপাল্টা চিন্তা করলে সরকার তো বসে থাকবে না। আপনারা মত প্রকাশ করেন। উল্টাপাল্টা চিন্তা করতে যান ক্যালা!

সে যাক, আকালুর চিন্তা এখন সৌরজগতের কাছে আচমকা গজিয়ে ওঠা একটা ছোটখাটো গ্রহ নিয়ে। গ্রহটা বেশ চালাক। নিজেকে ধরা দিতে চাচ্ছে না। হুটহাট রাডারে আসে আবার হারিয়ে যায়। নাসাও নাকি এটাকে নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে।

‘স্যার, চা নেন। লেবু চিপা দিসি। চিনি শেষ, আগামী এক বছর আর চিনির দেখা পাইবেন না। ঢাকা স্টেশন থেকে সাপ্লাই বন্ধ।’

রোবট পিয়নের নাম গবুচন্দ্র। বড়ই সাদাসিধে। ড. আকালুর

প্রিয় পাত্র।

‘কী বলিস গবু! বাজেটে টান পড়ল নাকি!’

‘নেপচুনের লগে একটা হাইপার ব্রিজ হইতাসে স্যার। ডাইরেক ঢাকা টু নেপচুন। অনেক টেকা খরচা হইতাসে।’

‘কিন্তু নেপচুন যাব কোন দুঃখে! এখন তো দুনিয়ার সবাই অ্যানড্রোমিডার জমি কিনতেসে শুনলাম।’

‘ঘটনা আছে। নেপচুনে আমগো নেতারা সেকেন্ড হোম বানাইতে বানাইতে গোটা গ্রহটারে সেকেন্ড বাংলাদেশ বানাইয়া ফেলসে। এই জন্য গ্রহটার লগে একটা সেতু দরকার।’

‘চায়ের লগে টোস্ট কই?’

গবুচন্দ্র টোস্ট আনতে গেল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে বড় পর্দাটার সামনে বসলেন আকালু। অনেক দিন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয় না। এর মধ্যে আবার একটা হাইপার ডাইভ দিয়েছেন বলে পৃথিবীর বন্ধুরা তার চেয়ে অনেক বুড়িয়ে গেছে। নম্বর টিপতেই কথা শোনা গেল ত্রাহি খন্দকারের।

‘খবর কী দোস্ত?’

‘ওরে আকালু রে! আমার অবস্থা ভয়াবহ। আন্তগ্যালাক্টিক সৌর নির্বাচনের দায়িত্ব পড়সে একার ঘাড়ে। সব মিলাইয়া পৌনে তিন লাখ ইলেকশন ইউনিট। কোথায় কী ঘটতাসে কিসুই জানি না। একটা কিসু ঘটলে সবাই আমার কাছে

জানতে চায়। সরকারি দল বিরোধী দল আধা-বিরোধী দল সবাই আমার উপরে নাখোশ। বড়ই বিপদে আছি। সোয়া তিন লাখ অনলাইন পত্রিকার ফোন রিসিভ করতে করতে আমি ক্লান্ত।'

'সব ছেড়েছুড়ে আমার মতো স্পেসশিপ নিয়া বাইর হইয়া পড়।'

'খাড়া একটা ফোন আসছে। হ্যালো, জি জি, আমরা কাউকে ছাড় দিব না, হনুলুলু গ্রহের চিয়াবা সম্প্রদায়ের নেতা উরিত্রা আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন? তার প্রার্থিতা বাতিল...।'

আকালুর হাতে অখণ্ড অবসর। সদ্য আবিষ্কৃত গ্রহটা অনেকক্ষণ ধরে সিগন্যালও দিচ্ছে না। সৌরজগতের নির্ধারিত জায়গা অতিক্রম করার পরই আমেরিকা। আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনটা এখন আলাদা একটা অঙ্গরাজ্য। স্টেশন এরিয়ার প্রবেশমুখে জ্বলজ্বলে হলোগ্রাফিক সাইনবোর্ডে লেখা, এখানে মহাকাশযানের বর্জ্য ফেলা নিষেধ, আদেশ অমান্যে পাঁচ কোটি ইউরো জরিমানা।

আকালু ইচ্ছা করেই বাথরুমের ফ্লাশটা ছেড়ে দিলেন। অবশ্য তার রাগের এই অতিক্ষুদ্র নমুনা ধরা পড়ল না কোনো মার্কিন রাডারে। তিনি আবার মনোযোগী হলেন তার সদ্য আবিষ্কারের দিকে। গ্রহটার মতিগতি বোঝার চেষ্টা চালালেন। পাশে বসলেন ড. নিনিনি। ইদানীং তিনি কারণে-অকারণে আকালুর ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছেন।

আকালু : নিনিনি, সইরা বসো।

নিনিনি : ওহ...সরি। তা আকালু তোমার গ্রহটা নাকি জ্যান্ত। ওইটা নাকি তোমার লগে বাতচিত করতেসে।

মনে মনে গবুচন্দ্রের ওপর খেপে গেলেন আকালু। বজ্জাত রোবটটার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সফটওয়্যার যে এভাবে অকৃত্রিম বোকামি করবে, কে জানত! নাকি বুড়ো রোবটটার অন্য কোনো মতলব আছে! নিনিনির সঙ্গে তার একটু গল্পের আয়োজন করে দিতেই...।

নিনিনি : কই বলো! গ্রহ তোমারে কী বলতে চায়?

আকালু : কিসু কইতে চায় না। আমারে সিগন্যাল দিতেসে আমি যেন তার ভেতরে ল্যান্ড করি।

নিনিনি : আমারে লগে নিবা বিজ্ঞানী? অবশ্য আমি তো তোমার লগেই আছি! হি হি।

আকালু : ফালতু কতা না কইয়া সিগন্যাল পাডাও। আমেরিকানরা গ্রহডারে পাইলে কইব জঙ্গি আছে, এরপর বোমা মাইরা উড়াইয়া দিব।

নিনিনি : এক কাম করো, যা আছে কপালে, চলো ল্যান্ড করি। ওহ, আম্মা ফোন দিসে, একটু কতা কই আসি।

নিজে নিজে বিড়বিড় করতে করতে আড়ালে গেলেন নিনিনি। আকালু আড়চোখে দেখছেন আর শুনছেন। কাউকে ব্রেনবুকে কথা বলতে দেখলে তার বিচিত্র লাগে। তার চেয়েও বড়

কথা, নিনিনির বাড়ি নোয়াখালী ইউনিটে। দ্রুত বলতে শুরু করলে কিছুই বোঝেন না আকালু।

‘আম্মা কী কইবা তাতাই কও। টাইম নাই। আঁই আকালুরে লই নতুন দুনিয়ায় নামমু একটু হর।’

‘তুই আর যাই করস, এই হাগলছাগলরে বিয়া করিস না।’

‘তোঁয়ার জামাই বলোক। অনেক টিঁয়াহইসা। চিন্তা নাই। হেতের অ্যানড্রোমিডায় দুইডা ফ্ল্যাট আছে।’

‘মঙ্গল গ্রহে কিনলেও এককেন কতা আছিল। যকগই (যা হোক) হেতেরে কইস মাইজদী স্পেস স্টেশনের (এমএসএস) কাছদি যদি যায় তাইলে যেন তোর চাচীর লগে এট্টু দেহা করে।’

‘আমরা অখন ওকগা নতুন গ্রহে যাইতেসি আম্মা। এমএসএস বহুত দূর। রাইখলাম।’

এ কথোপকথনে আকালু একটা বিষয়ই বুঝতে পেরেছেন, সেটা হলো, অ্যানড্রোমিডায় তার ফ্ল্যাটবিষয়ক কথা হয়েছে মা-মেয়ের মধ্যে। মাথা ঠাণ্ডা করতে দ্রুত কাজে মন দিলেন আকালু।

গ্রহটার যত কাছে আসতে লাগলেন, ততই যেন চোখ কপালে উঠে যাওয়ার দশা। গ্রহটা মাঝেমধ্যে উধাও হয়ে যাচ্ছে!

‘মনে হইতাসে, অন্য কোনো মাত্রায় আছে এই গ্রহ। এটা সম্ভবত কোনো সময় চক্কর। ঢুইকা পড়লে অন্য সময়ে যাওন

যাইব।’

‘তাইলে চলো গ্রহে নামি। এক মাস আগে ফেরত গিয়া দেখি আসি আমার কানের দুলটা কই রাখসিলাম।’

গ্রহের অবয়বটার কাছাকাছি আসতেই সিগন্যালে অনেক অস্পষ্ট কথাবার্তা শুনতে পেলেন আকালু। অনেক শোরগোল। শব্দগুলো নিশ্চয়ই অতীত বা বর্তমান থেকে আসছে। আরো কাছাকাছি আসতেই ডিসপ্লে তে ঝিরঝির করে অনেক দৃশ্য ভেসে উঠল। মানুষ মাটি নিয়ে কী যেন করছে। ভেতরে কী যেন ঢুকিয়ে দিচ্ছে আর অমনি গাছের মতো কী যেন বের হচ্ছে মাটি ফুঁড়ে। কম্পিউটারে বর্ণনা চালু করে দিলেন আকালু। কম্পিউটার বকবক করে যাচ্ছে। কিছু বুঝতে পারছেন, কিছু পারছেন না।

‘এটা হলো কৃষিকাজ। মাটিতে মানুষ আগে গাছ লাগাত। তবে সিগন্যাল আসছে ভবিষ্যৎ থেকেও। মানে ভবিষ্যতেও মানুষ গাছ লাগাবে। তবে অন্য কোনো গ্রহে। গাছ লাগালে গাছ বাড়ে। তা থেকে ফসল হয়। ওটা মানুষ খায়।’

আরেকটা ভিডিও এলো পর্দায়। বর্ণনা দিল কম্পিউটার।

‘এই মিষ্টি পানির ভাণ্ডারকে বলা হয় নদী। আর জ্বালানিবিহীন জলযানটি সরাসরি হাত দিয়ে চালাতে হয়। এর নাম নৌকা। নৌকায় বসে দুটি মানুষ পৃথিবীর উপগ্রহ দেখছে খালি চোখে।’

নিনিনির কণ্ঠে বিস্ময় ‘কয় কী! হেগো বুঝি ফুড ফ্যাক্টরি নাই!

মাটি ফুঁড়ি খানা বাইর অয়! তাইজ্জবের ব্যাপার। তবে নৌকা বিষয়টা আমার ফছন্দ হইসে। আহা, এই পানি নিশ্চয়ই খাওন যাইব!'

আকালু ভেবে পেল না, নদীতে নৌকা চালাতে চালাতে মানুষটা ওই বস্তির মতো উপগ্রহটার দিকে তাকিয়ে আছে কেন। ওর চোখে তো টেলিস্কোপও নেই।

আকালুর ফোনে রিং হচ্ছে। গ্যালাক্টিক সার্ভারের সঙ্গে তার ফোনবুকের সংযোগ থাকা সত্ত্বেও নাম্বারটা আননোন দেখাচ্ছে!

'হ্যালো।'

একটা খসখসে বুড়োর গলা শুনতে পেলেন আকালু।

'আমি হইলাম তুমি। ভয় পাইয়ো না।'

'কিডা?'

'আমি আকালু, ভবিষ্যত থিকা তুমারে ফোন দিসি। আমার বয়স এখন ধরো ৯০।'

'কন কী!'

'তোমারে জরুরি বিষয় জানাইতে এত কাহিনী করতে হইসে, বুঝলা তো। সামনে যে গ্রহটা ঝিলিক মারতেসে, ওই কোনো গ্রহ না। ওইটা একটা সময় চক্কর। আর আমরা আছি অতীতে। মানে ভবিষ্যতে গিয়া টাইম মেশিন বানাইয়া আবার

অতীতে আসছি।’

‘বুঝবার পারসি। কিন্তু কেমনে কী! এসব কী দেখতেসি ওস্তাদ!’

‘দেখাদেখির কিসু নাই। এই টাইম মেশিন গ্রহটাতে ঢুইকা তুমি সিধা ১৯৮০ সালের বাংলাদেশে চইলা যাবা। লগে একটা কম্পিউটার রিং পইরা যাইয়ো। ওইটা তোমারে চাষবাস, নৌকা চালানি, হাঁস-মুরগি পালা, সব শিখাইয়া দিব। আর ভুলেও নিনিনিরে বিয়া কইরা লইয়া আসবা না। ও এখনো আমার জীবন ফানা ফানা কইরা দিতেসে।’

‘ওকে ওস্তাদ। এখুনি রওনা দিতেসি।’

ভবিষ্যতের আকালুর পরের সতর্কবার্তায় খুশি খুশি লাগল আকালুর। বুড়ো মানুষ রাগের মাথায় কী না কী বলল, তাতে কান দেওয়ার দরকার কী! বড় কথাটা হলো, ৯০ বছর বয়সেও নিনিনি তাকে ছেড়ে যায়নি। সংসার করেছে। তো, তাকে বিয়ে না করার কোনো কারণ দেখছেন না আকালু।

আকালুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিনিনি বললেন, ‘তোঁয়ার চোখে এত ঝিলিক মারের কিলাই?’

‘টাইম মেশিনে অতীতে যাইতেসি। এরপর দুইজনে মিলা নৌকা চালামু আর চাঁদ দেখুম। ওইখানে কইলাম কোনো ব্রেনবুক-ট্রেনবুক নাই।’

‘আমি আর তুমি থাকলে ব্রেনবুকের দরকার নাই। অবশ্য

পরে আইসা আম্মা, বড় আফা আর শেফালি খালারে নিলে...।’

আকালু কঠিন মুখ করে ফেললেন। সহসা জবাব দিলেন না। তবে মনে মনে এ-ও ভাবছেন, ১৯৮০ সালটা খারাপ না। সবাই যদি কাছাকাছি থাকে, তা হলে ওই সব বুকটুকের কী দরকার!

মতিনের স্থান-কাল

ওস্তাদ ডাইনে চাপেন বামে প্লাস্টিক! হেলপার রোবট মন্টুর কথা শুনে স্পেসশিপটাকে ডানে চাপালো মতিন। পাশ ঘেঁষে উড়ে গেল নাসার যাত্রীবাহী মহাকাশযান। মহাকাশ গবেষণা ছেড়ে সংস্থাটি এখন পেসেঞ্জার আনা নেয়া করে। গবেষণার কাজ করে বাংলাদেশের 'বাসা'।

বিপ বিপ শুনে মনিটরের সুইচ অন করলো মতিন। পৃথিবী থেকে এখন দুই আলোকবর্ষ দূরে সে। কল দিয়েছে মর্জিনা। তিন কূলে তার একমাত্র আপন মানুষ। কিন্তু ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকে।

'হেই ড্রাইভার! ওহ স্যরি মাই ডিয়ার মতিন, কেমন আছো, তোমাকে যা যা আনতে বলেছি সব মনে আছে তো?'

'দেখো মর্জিনা আমি নসিমন ব-২০ এর পাইলট। তমিজ কইরা কতা কও।'

'কী! তোমার মতো একটা স্পেসশিপের ড্রাইভারকে এখন স্যার স্যার করতে হবে! তুমি জানো!, আমার বাবা কিছুতেই তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিত না। কিন্তু, কী করবো বল স্পেসশিপ ড্রাইভাররা আমাকে খুব টানে।'

'আমি আর যাই করি তোমার বাপের মতো ইলেকশনে খাড়াই নাই। আমার দুই নম্বরি টেকা নাই। কিন্তু আমার সাহস আছে।'

'হুঁ! পারলে কুরুক্কু গ্রহ থেকে এক বালতি হীরে আইনা দাও! তারপর দেখা যাবে কেমন সাহস।'

'সাহস থাকলে চুরি করতে হইবো ক্যান! আর তুমি তো আমার লগে চক্কর দিতেসো এই কারণে, হীরার লোভে।'
লাইন কেটে দিল মর্জিনা। বিষণ্নতা ভর করলো মতিনের মনে। অকারণে যান্ত্রিক কাশি দিয়ে মন্টু বলল, 'উস্তাদ, এখুনি আপনের মস্তিষ্ক থেইকা উল্টাপাল্টা সিগনাল পাইতেসি।'
'সব ঠিক আছেরে মন্টু, সব ঠিক।'
পথে যেতে যেতে মতিনের চোখে পড়লো এক বিশাল স্পেস সভা। মন্টুই বলে দিল ঘটনাটা।
'গ্যালাক্সি উত্তর আর গ্যালাক্সি দক্ষিণের মেয়র ইলেকশন হইবো। এরা সবাই প্রার্থী। আমগো দেশিও আছে।'
রেডিও তরঙ্গে কান পাতলো উৎসুক মতিন। বিভিন্ন গ্রহের প্রার্থীরা তাদের নিজেদের সম্পর্কে ঘোষণা দিচ্ছে আর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। মেয়র হলে কক্ষপথের ভাঙাচোরা স্যাটেলাইটগুলোর জঞ্জাল সাফ করে দেবে, গ্রহের মর্যাদা পেতে এখন আর কোনও গোলকের বাসিন্দাকে গ্যালাক্টিক হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে না, পৃথিবীতেই মিলবে নিবন্ধন ফরম, বাংলাদেশি কয়েকজন প্রার্থীর কথাও কানে এলো। একজন তেমন কিছু বললেন না। ইনিয়ে বিনিয়ে বললেন, তিনি অনেক গরিব, তার হোভার ক্রাফট নাই। গোটা ছায়াপথে খুঁজলে তার এক বাড়ি পাওয়া যাবে না। আরেকজন সগর্বে ঘোষণা দিল তার নামে চুরাশিটা রাষ্ট্রীয় ও তেপ্পান্নটা ইন্টার-গ্যালাক্টিক মামলা আছে। বলেই চুপ! ভেবেছিলেন মামলার কথা শুনে সবাই তাকে বেশ হোমরাচোমরা মনে করবে। তিনি ভুলে গেছেন যে এটা তার ঘরের ইলেকশন না, এটা আন্তঃনক্ষত্রপুঞ্জ নির্বাচন। এখানে মামলার দাম নাই।

উল্টো আরও ক্ষতিই হলো।

মেজাজটা গরম হয়ে গেল মতিনের। এইভাবে এতগুলো গ্রহের সামনে নিজেদের এভাবে উপস্থাপনের মানে কী! এর মাঝে আবার কে যেন প্রশ্ন ছুড়লো, মেয়র ইলেকশনের সঙ্গে গাড়ি-বাড়ির কী সম্পর্ক মশাই? তা ছাড়া সৎ হতে হলে গরিবই হতে হবে এমনটাই বা কে বলেছে? আরেকজন বলল, মামলার এজাহারভুক্ত আসামি হয়েও নির্বাচনে অংশ নিতে পারে এমন ঘটনার কথা তিনি সিলিকন যুগের একটা পত্রিকায় পড়েছিলেন।

এদের কথাবার্তা বেশিক্ষণ শুনলে হাইপারটেনশন হয়ে যাবে। তাই তড়িঘড়ি করে হাইপারডাইভ দিল মতিন। চলে গেল আরও তিন-চার আলোকবর্ষ দূরে।

'উস্তাদ আমরা চাইলে এখন ব্যাকগিয়ারে ছবি দেখবার পারি।'

'মানে? ওহ আচ্ছা আচ্ছা!' বুঝতে পারলো মতিন। এর মানে হলো তাদের পেছনে এখন পৃথিবী থেকে আসা পুরনো আলোর রশ্মি। ওটা ভিডিও করতে পারলেই অতীতের দৃশ্য দেখতে পারবে তারা। বাটন চাপতেই পর্দায় ভেসে উঠলো অতীতের পৃথিবী। জুম করে দেখলো মতিন। আহা! পুরনো ঢাকা!

সবার আগে দেখতে চাইলো মর্জিনাকে। বলা মাত্রই ডিসপ্লেতে হাজির। একি! সঙ্গে এটা কে! মর্জিনা কার সঙ্গে এভাবে রিকশাপ্টারে উড়ে বেড়াচ্ছে! আধ ঘণ্টা পর মতিন নিজেকেই দেখতে পেল, মর্জিনা তার সঙ্গেও মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছে! মন্টুর খুক খুক শব্দের হাসি শুনে জলদি ডিসপ্লে ঘুরিয়ে দিল মতিন। মনটা তেতো হয়ে গেছে। আবার মনের

একটা অংশ হাঁফ ছেড়েও বাঁচলো যেন। নিজেকে পিছুটান মুক্ত মনে হচ্ছে। কিন্তু এখন সে কী করবে? একটা কিছু ভাবার আগেই ডিসপ্লেতে চোখ আটকে গেল। মন্টুই চ্যানেল ঘুরিয়ে দিয়েছে। মেয়র প্রার্থীদের কয়েক বছরের অতীতের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। যে বলেছে তার হোভারক্রাফট নাই, সে আসলে মিথ্যা বলে নাই। তার হোভারক্রাফট নাই, তবে গোটা দশেক স্পেসশিপ আছে। বাড়ি যে নেই এটাও সত্য। সে আস্ত একটা শহরের মালিক। আরেকজনকে দেখা গেল জাপাস্টিক গ্রহের (যে গ্রহে এখনও রাজতন্ত্র টিকে আছে) স্বৈরাচারী রাজার পিছে পিছে ঘুরছে। স্বৈরাচারীর বগলদাবা হয়ে তিনি গ্যালাক্সিতে কী করে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করবেন ভেবে পেল না মতিন।

অতীত দেখে আর কাজ নাই। সময়টাই খারাপ। পরবর্তী মিশন ঠিক করে ফেলল। হাইপারডাইভ দিয়ে ব্ল্যাকহোলের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল স্পেসশিপটাকে। কাছাকাছি থাকা একটা গ্রহ পেয়ে গেল। ওতে নামবে ঠিক করলো। মন্টুর চোখও চকচক করছে।

'উস্তাদ এইখানে নামলে তো সব আউলাইয়া যাইবো।'

'যা খুশি হোক, এই টাইমে আর থাকতে চাই না। সব সাফ হইয়া যাক। তারপর ফিরা যামু।'

'এই গ্রহের এক মিনিট মানে দুনিয়ার দশ বছর।'

মন্টুর কথায় কান নেই। মতিন নামছেই। অবতরণও করে ফেললো নতুন স্থান-কালের এক গ্রহে। নেমেই বুঝতে পারলো মহা ভুল হয়ে গেল। আশপাশে তার মতো আরও অনেক বাংলাদেশি নভোচারী। কেউ চা খাচ্ছে, কেউ তাস

নিয়ে বসেছে, কেউ কাত চিৎ হয়ে ঘুমুচ্ছে। মতিনকে দেখে একজন বলল 'আসেন ওস্তাদ। ডরাইয়েন না। দুনিয়া আমাদের বুঝলো না হে হে হে। তবে টাইম হোক, আমরা বুঝাইয়া দিমু সবাইরে, হেহে।'

মন্টু কিছু না বললেও মতিন বুঝে গেল এরা কারা। সবাই ফেরারি আসামি। এখানে এক দিন কাটালেই পৃথিবীতে কয়েকশ বছর কেটে যাবে। এই সুযোগে ওদের মামলাগুলোও চাপা পড়ে যাবে। পরে কেউ চিনবেই না। ফিরে গিয়ে আবারও চুরি-ডাকাতি শুরু করবে। মতিনের খানিকটা গর্বও হলো। ব্ল্যাকহোলকে ব্যবহার করে শাস্তি থেকে বাঁচার বুদ্ধি বাঙালিই প্রথম আবিষ্কার করলো! ভয়ও পাচ্ছে, এই লোকগুলোকে সঙ্গে নিয়েই তাকে আবার ফিরতে হবে ভবিষ্যতের বাংলাদেশে।

বিজ্ঞানী বজলু ও সুপারম্যান-৫৩

উন্নয়ন-৩ নামের মহাকাশযানে চড়ে গুরুত্বপূর্ণ মিশনে বের হয়েছেন সরকারি বিজ্ঞানী বজলু। মিশনের ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটে রাখতে হবে। সঙ্গে থাকা মন্টু অবশ্য সব জানে। তাকে নিয়ে ঝামেলা নেই। কারণ মন্টু একটা চতুর্থ শ্রেণির রোবট। মিশনে বিজ্ঞানী বজলুর একমাত্র অ্যাসিসট্যান্ট। বদঅভ্যাস একটাই, টুকটাক দুই নম্বরি করে।

‘স্যার সিধা রাস্তায় কক্ষপথ পার হইতে গেলে আলোকবর্ষ পার হইয়া যাইব। স্যাটেলাইট আর হোভারক্রাফটের জ্যাম লাগসে। এক কাম করেন এই সমীকরণ ধইরা চালান। পনের ডিগ্রি ডাইনে চাপাইয়া তারপর অ্যাকসিলারেশন বত্রিশ হাজার মিটার.. ।’

‘কথা কম! একদম চুপ! ওটা উল্টাপথ!’

‘স্যার আপনে একটু জিরান। বাক্সে গিয়া একটু জিরো গ্র্যাভিটির ঘুম দেন। রকেট আমি চালাই। আমি তো মেশিন। ঘুম টুম লাগে না।’

মায়াভরা কথাটা শুনে হাই তুলে ফেললেন বিজ্ঞানী বজলু। গা মোচড় দিয়ে উঠে চলে গেলেন স্লিপিং বক্সের দিকে। কিন্তু পাঁচ মিনিটও ঘুম হলো না। সাইরেন শুনে ধড়ফড় করে উঠলেন। কন্ট্রোল প্যানেলে এসেই দেখেন মহাকাশযান দাঁড়িয়ে আছে। সামনে স্পেস ট্রাফিকের উড়ন্তযান। রেডিওতে ট্রাফিকের গলা।

‘স্যার আপনার স্পেসশিপ উল্টোপথে এসেছে। মামলা দিতে হবে।’

‘এ তো মহা মুশকিল মন্টু!’

রোবট মন্টুর মুখে শয়তানি হাসি। ট্রাফিকের দিকে তাকিয়ে মশকরা করতে ছাড়ল না, ‘স্যার, সব রকেট উল্টাপথে আইলেই তো ভালা। পাবলিক তখন সোজা পথে আরামসে যাইতে পারবো।’

বিজ্ঞানী বজলুর মাথা এখনও কাজ করছে না। রেডিওতে ট্রাফিক পুলিশকে বললেন, ‘মহাশূন্যে উল্টোপথ বলে কিছু নেই। আমি যাচ্ছি এক মহা গুরুত্বপূর্ণ মিশনে।’

‘কিন্তু স্যার, এখন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কম্পিউটার সিসিসি গেলেও আমি মানবো না। আপনাকে ঘুরে যেতেই হবে।’

তর্কে গেলেন না বিজ্ঞানী বজলু। পাশেই সাংবাদিকদের হোভারক্রাফট গিজগিজ করছে। দুয়েকজন ওয়্যারলেসে জানতেও চাইছে, কেন বিজ্ঞানী জেনেশুনে উল্টোপথে আসলেন। বিজ্ঞানী বজলু জবাব দিলেন না। মন্টু আগ বাড়িয়ে বলতে চায়, ‘আমরা গুরুত্বপূর্ণ সরকারি মিশন..।’ বিজ্ঞানীর কটমট দৃষ্টি দেখে চুপ মেরে গেল। ট্রাফিক একগাল হেসে বলল, ‘মাদারশিপের নির্দেশ স্যার। আমাদের কিছু করার নেই।’

বিজ্ঞানী বজলু ঘুমকাতুরে চোখে আবার উন্নয়ন-৩ ঘুরিয়ে আগের পথে নিয়ে গেলেন। পাশ দিয়ে শোঁ করে একটা

মহাকাশযান যেতে দেখলেন। ট্রাফিক অসহায় দৃষ্টিতে যানটার চলে যাওয়া দেখল। থামানোর সুযোগই পেল না। বিশেষ যানগুলো তাদের রাডারে ধরা পড়ে না। বজলু চিনতে পারলেন যানটাকে। রকেটের জ্বালানির রঙ বেগুনী আর বডিতে একটা বড়সড় এলিয়েনের খুলির ছবি আঁকা। ইন্টারগ্যালাক্টিক নিরাপত্তা কমিটির বাংলাদেশ প্রতিনিধির গাড়ি। মহা ক্ষমতাধর। বজলু রাগে গজগজ করলেন, 'তুমিও বুঝবা চান্দু। শুধু আমার মিশনটা সফল হোক।'

'স্যার, একটু ফোন টোন করলেই পারতেন। হুদাই এখন আবার জামের মইদ্যে পড়তে হইবো।'

'মন্টুরে একটু সবর করো। রোবট হয়েই যদি এত অস্থির হয়ে যাও।'

'এবার বুঝেন স্যার পাবলিকের কেমুন লাগে। উল্টাপথে তো অনেকেই যায়।'

'মিশন সফল হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কেউ আর উল্টা কাজ করার সাহস পাবে না।'

মহাকাশযান চলল অনেক অনেক দিন। এর মধ্যে হাজার হাজার অংক কষলেন বিজ্ঞানী। গবেষণা চালালেন অতিপ্রাচীন হলিউডের সিনেমা নিয়েও। গ্রহটা খুঁজে পেতেই হবে। শেষে কাজে আসল মন্টুর বুদ্ধি। 'স্যার, কোনো একটা অকাম করেন। দেখবেন আপনারেই ওরা ধরতে আসবে। ওদের তো অনেক পাওয়ার।'

বুদ্ধিটা মন্দ না। বিজ্ঞানী বজলু তার মহাকাশযানের যত আবর্জনা সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে লাগলেন। মহাকাশ আইনে নবম মাত্রার অপরাধ। ধরা পড়তে এক মিনিটও লাগল না। এ দিকটায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কোনো স্পেসশিপ বা পোশাক ছাড়াই মহাকাশে উড়ে বেড়াতে পারে। অনেক বাকবিতণ্ডা আর ঘটনা বুঝিয়ে বলতেই তারা বিজ্ঞানী বজলুকে এ যাত্রা ক্ষমা করল। তাদের অনুসরণ করেই শেষে গন্তব্যে পৌঁছাল বিজ্ঞানী ও তার রোবট মন্টু।

‘স্যার এটাই কিপটাদের গ্রহ? ’

‘ভদ্রভাবে কথা বল! কিপটা নয়, এটা ক্রিপটন।’

‘স্যার ওই যে ভাতের হোটেল মনে হয়! জলদি চলেন। আমার জইন্য ক্রিপটনিয়ান চার্জারের অর্ডার দিয়েন।’

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কাউন্সিলের ব্যাজ দেখাতেই রেস্টুরেন্টে বিশেষ খাতির পেলেন বিজ্ঞানী বজলু। মূল্যতালিকায় চোখ গেল মন্টুর। ‘খাইসে, ভাতের দাম এত কম! এখান থেকে চাউল নিয়া পৃথিবীতে যামু। দুনিয়ায় তো এখন মিনিকেটের কেজি সাড়ে চুয়াত্তর হাজার টেকা।’

‘তা তো হইবই মন্টু। চাইল ডাইল সব তো রিশিদ্রি গ্রহে মজুদ করা।

খেতে খেতে এটা ওটা গল্প শেষে মিশনের দেখা পেলেন বজলু। প্রাগৈতিহাসিক সুপারম্যানের বংশধরের সন্ধানে

এসেছিলেন তারা। পেয়েও গেলেন। স্যুটটাই পরা রাশভারি এক ক্রিপটোনিয়ান। পৃথিবীর জন্য তার পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া অবদানের কথা মনে করিয়ে দিতেই গর্বে বুক ফুলে ঢোল তার।

‘হে মনুষ্য, বল কী করতে পারি তোমাদের জন্য।’

‘দুনিয়া এখন উল্টাপথে চলতাছে। চাউলের দাম লাখ টেকা হইবো কদিন পর। রাজ্যের মানুষ ভালো নাই। গ্যালাক্টিক সমিতিও কিছুর ধার ধারে না। আপনি হইবেন গ্যাদুদের (গ্যালাক্টিক দুর্নীতি দমন) নেতা। বেতন যা চান পাইবেন।’

‘এত বড় অনাচার! চল তবে! আমি সুপারম্যান নম্বর তিপ্পান্ন আছি তোমাদের সঙ্গে।’

কক্ষপথে ঢুকতেই বিপত্তি। পৃথিবী ছেড়ে আসার সময় উল্টোপথের রুটটা ছিল খালি। ট্রাফিক নেই দেখে সব মহাকাশযান ঢুকে পড়েছিল সেই উল্টোপথেই। সোজা পথের চেয়ে উল্টোপথেই এখন জ্যাম। এদিকে ফিরতি পথে আটকে গেছে বিজ্ঞানী বজলুর মহাকাশযান। কারো কথার ধার না ধেরে মন্টু চলে গেল উল্টোপথে, মানে যেদিকে জ্যাম কম সেদিকে। গিয়েই পড়ল আন্তমহাকাশীয় ট্রাফিকের হাতে। মহাকাশযান যেতে দিচ্ছে না দেখে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এল সুপারম্যান তিপ্পান্ন। নিজের পরিচয় দিল। একগাল হেসে ট্রাফিক সার্জেন্ট বললেন, ‘আন্ডারওয়্যার ভিতরে পরেন আর বাইরে, আইন সবার জন্য সমান।’

অ্যানড্রোমিডার মশা

শক্তিশালী স্পিকারে অস্বাভাবিক গুঞ্জনটা কানে আসতেই আনন্দ এবং ভয় একসঙ্গে ছেঁকে ধরলো জাতীয় গ্যালাক্সি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী উহুকে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো কিছুক্ষণ গুঞ্জনটা শুনলেন। খানিক পরেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলেন পাশের যোগাযোগ মডিউল রাখা রুমটায়। চেয়ারে বসে ঝিমুচ্ছিল চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী আঁই-রোবট। দেখেই মেজাজ খিঁচড়ে গেল বিজ্ঞানী উহুর। 'সরকারি রোবটগুলো কোনো কাজের না' বলে কোনও রকম মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করলেন। নিজেই যোগাযোগ মডিউল অন করে কল করলেন ঢাকা উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের চার সিটি করপোরেশন প্রশাসককে।

'সম্মানিত প্রশাসকবৃন্দ। আমাদের ধারণা সত্যি প্রমাণ হয়েছে। ভিনগ্রহের প্রাণীর সঙ্গে মানুষের এই প্রথমবার সাক্ষাৎ ঘটতে যাচ্ছে।'

'যা কইবা খুইলা কও। মাইঝরাইতে আমার ভিনগ্রহের প্রাণীরে মেহমানদারির খায়েশ নাই। তাছাড়া মিডিয়ারে খবর না দিয়া আমগোরে ডাকলা ক্যান? এইখানে সিটি করপোরেশনের কুনু হাত নাই।'

খুব একটা হতাশ হননি বিজ্ঞানী। আবারো বললেন, 'আপনাদের ডেকেছি কারণ দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণ শেষে আমরা নিশ্চিত হয়েছি, প্রাণীগুলো ঠিক মানুষের মতো নয়।

এটা দেখতে অনেকটা মশার মতো। তাই ইয়ে.. মানে..। আর মশাগুলো ঢাকার দিকেই আসছে।'

'ধুর মিয়া! শহরের মশা নিয়া কূল পাই না, আর আপনি ইমপোর্টেড মশা নিয়া আইবার লাগসেন।' আরেকজন বলল, 'এই মশা যেহেতু বাইরের, তাই আমার মনে হয় না এরা আমার এখতিয়ারে আছে।' আরেক প্রশাসকের সাফ কথা, 'আরে ভাই, এইটা যে মশা সেটা নিশ্চিত হইলেন কেমনে? এই মশা মিডিয়ার সৃষ্টি।'

বিজ্ঞানী ইনিয়ে বিনিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, 'ইয়ে মানে, মশার মতোই তো প্রাণীটা।'

'আগে আসুক, রক্ত খাইয়া যাক, তারপর দেখুম।'

একে একে চার সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তা অফলাইনে চলে গেলেন।

বিজ্ঞানী উহু অসহায় দৃষ্টিতে তাকালেন আঁই-রোবটের দিকে। নোয়াখালী জোনের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত এ রোবট তার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কারণেই এখানে চাকরি পেয়েছে। বিজ্ঞানীর দিকে তাকিয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করলো আঁই-রোবট। ব্লিপ ব্লিপ শব্দ করে খানিকটা কেশে নিয়ে বলল, 'ছার, আঁর মনে অয় যা করনের আঙ্গোরেই করন লাইগবো। নইলে কাম্বাই হাডাই আলাইবো (কামড়ে ফাটিয়ে ফেলবে)।'

স্মার্ট ট্রান্সলেটর যন্ত্রের সাহায্যে আঁই-রোবটের কথার মর্ম

বুঝতে পারলেন বিজ্ঞানী উহু। তবে অনেক ভেবেও কূল পেলেন না। অপেক্ষায় রইলে ভিনগ্রহের মশার আগমনের।

পরদিন টিভি খুলতেই শিউরে উঠলেন বিজ্ঞানী। ঢাকা শহর ছেয়ে গেছে নতুন মশায়। মানুষ ঘর ছেড়ে বের হচ্ছে না। সবাই মশারির তলায়। আগানে বাগানে অফিস আদালতে সবাই স্প্রে হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। টিভিতে লাইভ সম্প্রচার চলছে। নগরীর পরিত্যক্ত একটা ভবনে আস্তানা গেড়েছে এলিয়েন মশার দল। সেখানে আবার সোয়া দুইশ টিভি চ্যানেলের ক্যামেরা হাজির। কামড় খেতে খেতে বলে যাচ্ছে সাংবাদিকরা, 'হ্যাঁ, দর্শক আপনারা জেনে থাকবেন, এরই মধ্যে অ্যাঁ.. মশাগুলো উঁ.. ঠাস.. যা বলছিলাম.. ও মাগো.. ভিনগ্রহের এই মশারা ভীষণ আক্রমণাত্মক। তারা সংঘবদ্ধ। নিচ্ছি কুহুহি ব্র্যান্ডের কয়েল বিরতি।' বিজ্ঞাপন শুরু। এক কয়েল চলবে টানা বত্রিশ দিন। ধোঁয়া নেই, কারণ এই কয়েল জ্বালাতে আগুনই লাগে না। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কয়েল! মশা যে গ্রহেরই হোক না কেন, ধরাশায়ী হবেই!

ভিনগ্রহের প্রাণী আসতে না আসতেই ব্যবসা! বিড় বিড় করে রাগ ঝাড়লেন বিজ্ঞানী উহু। একটু পর শোনা গেল চিকন সুরের কথা। মশাদের সংবাদ সম্মেলন শুরু। তাদের প্রতিনিধি হিসেবে টিভি চ্যানেলের মাইক্রোফোনগুলোর সামনে এগিয়ে এসেছে একটা বিশাল সাইজের মশা। সদ্য শেখা বাংলায় জ্ঞানী মশাটা বললো-

'সম্মানিত মানুষবৃন্দ। সমগ্র গ্যালাক্সিতে বসবাসের কোনো

জায়গা আমরা খুঁজে পাই নাই। অ্যানড্রোমিডা গ্যালাক্সিতে আমাদেরও একটা গ্রহ ছিল। কিন্তু.. (কান্নার মতো চিঁ চিঁ শব্দ).. কিন্তু সেখানকার সরকার বড্ড বেশি পরিচ্ছন্ন। চারদিক ঝকঝকে তকতকে, কোথাও বদ্ধ জলাশয় ডোবা পানাপুকুর নাই.. উফ! কী ভয়ঙ্কর! তবে এই এক বঙ্গদেশকেই পাইলাম যেখানে আজ পর্যন্ত আমাদের বাসস্থান অক্ষুণ্ন আছে। সুজলা সুফলা নর্দমা, জলাশয় আর নোংরায় ভরা এই ঢাকায় আমরা খুঁজে পেয়েছি আসল ঠিকানা। এই জন্য সবার আগে আমাদের সবার পক্ষ থেকে আমি চার প্রশাসককে আমাদের সূঁচের অগ্রভাগ থেকে ধন্যবাদ জানাই। কৃতজ্ঞতাস্বরুপ আমরা চার ভাগে ভাগ হয়ে প্রত্যেক নগর প্রশাসককে সম্মানিত করতে তাহাদিগের শরীর হইতে এক চুমুক করে রক্তপান করে আসবো।

ব্লিপ ব্লিপ ব্লিপ। চার প্রশাসকই বিজ্ঞানী উহুকে একসঙ্গে কল দিয়েছেন।

‘ও বিজ্ঞানী.. এইডা তো ভালই যন্ত্রণা হইলো। কিসু একডা কর!’

‘হে গবেষক, বাইরের মশারা তো আমাদের ইজ্জত রাখলো না।'

‘আমার কাছে বিষয়টা বিরোধীদলের চক্রান্ত মনে হয়েছিল। তথাপি এই বিদেশি জঙ্গি মশাদের বিরুদ্ধে এখন সবাইকে একতাবদ্ধ..ওহ না কী সব ভাষণ শুরু করলাম! বিজ্ঞানী! নতুন কোনো স্প্রে আছে?’

বিজ্ঞানী উহু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। সবাই তার দিকে তাকিয়ে থাকলেও তিনি তাকালেন আঁই-রোবটের দিকে। আঁই-রোবট ঝিমুচ্ছে আর একটু পর পর জাবর কাটছে। ইদানীং কী একটা পাতা চিবুতে থাকে সারাদিন। এই পাতার রসে নাকি চার্জ আছে। 'হুম, ছার আঁই বুদ্ধি হাইসি। আঁই মশাগুনের লগে কতা কমু।'

আশার আলো দেখতে পেলেন বিজ্ঞানী। আঁই-রোবটও দেরি না করে হাঁটতে শুরু করে দিল। আয়েশি ভঙ্গিতে হাঁটার ধরন দেখে আবারও সরকারি রোবট বলে তিরস্কার করতে যাচ্ছিলেন বিজ্ঞানী। তবে করলেন না। ভাবলেন, কত ধীরস্থির! অথচ কত কী যে আছে ওই ন্যানোটেক মগজে!

ঘণ্টাখানেক পরই ফিরে এলো আঁই-রোবট। ধুম করে বসে পড়লো চেয়ারে। বিজ্ঞানী টিভি অন করলেন। চারদিকে কেবলই বিজয়োল্লাশ। ভিনগ্রহের মশারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা চলে যাবে।

'একি! তুমি কী ঘটিয়ে দিয়েছো হে রবুচন্দ্র!'

'হেগুনেরে এক্কেন বুদ্ধি দিসি।'

'কী বুদ্ধি!'

'এই দেশে এমনিতে জায়গাজমি কম। তোমরা নিজেরগো গেরামে যাও গিয়া। হিয়ানে তোমরা ইচ্ছামতো থাকতে ফাইরবা।'

‘তুমি বললে আর অমনি রাজি হয়ে গেল?’

‘না, আঁই তো কইসি তোঙ্গো শহরে যদি ময়লা, ডোবা-নালা না থাকে তাইলে আংগো শহরের ম্যানেজারগো লইয়া যাও। উনারা মশার অনুকূল পরিবেশ তৈয়ারিতে বিশেষরকম ট্রেনিং ফ্রাপ্ত। বেগগিন (সব) ঠিক করি দিব। কিল্লাই বাবু এডে গুতাগুতি করন! (কেনরে বাপু এখানে গুতোগুতি করছো)'

‘বলছো কী! তারপর?’

রবুচন্দ্র বলার আগেই ব্লিপ ব্লিপ ব্লিপ।

নগরকর্তারা আবার ফোন দিয়েছেন। গলা ফাটিয়ে বাঁচানোর আকুতি করছেন তারা। এলিয়েন মশার দল তাদের ছেঁকে ধরেছে। মশার হাত থেকে বাঁচতেই সবাই স্পেসশুট পরে নিয়েছেন। সেটা দেখে মশারা আরো খুশি। কাজ এগিয়ে গেছে তাদের। খানিক পর ঘন কালো মশার চাদরে ঢাকা পড়লেন চার নগরপতি। চার জনকেই উড়িয়ে নিয়ে গেল হাইপারসনিক মশার দল।

বিজ্ঞানী মতিনের মহা আবিষ্কার

১

বিজ্ঞানী মতিন ক্রয়োনপাধ্যায়ের হাত সচরাচর কাঁপে না। তবে বোতামটা চাপতে গিয়ে দেখলেন আঙুলের ডগায় রিখটার মাপনী বসানো উচিৎ ছিল। আবিষ্কারের উত্তেজনায় হাত কাঁপছে! দীর্ঘ দশ বছরের সাধনা আজ চালু হতে যাচ্ছে! বোতামে চাপ দিতেই চোখ পিট পিট করে তাকাল বয-১। বয মানে 'বাংলা যন্ত্রমানব'। পুরোপুরি বাংলা বলবে ও বুঝবে এ রোবট।

'অভিবাদন গ্রহণ করুন মহান ক্রয়োনপাধ্যায়। বলুন আমি আপনার কী সেবায় আসতে পারি।'

রোবটের মুখে গায়কি ঢঙে বলা কথাগুলো শুনে বিজ্ঞানীর চোখে জল আসার উপক্রম। কোনোমতে পানি সামলে বললেন, 'ওরে বযো, আমাকে এক গ্লাস পানি দে।'

'আপনার নির্দেশনা বুঝতে পারিনি জনাব। দয়া করে বাংলায় পুনরাবৃত্তি করুন।'

আবেগের কান্নাটা মাঝপথে আটকে হেঁচকি হয়ে গেল। বিজ্ঞানী বুঝতে পারলেন না ঘটনা কী। রোবটটা বুঝলো না কেন? আবার বললেন বিজ্ঞানী, 'বযো-১ আমাকে এক গ্লাস পানি দাও। ঠাণ্ডা পানি।'

'আপনার নির্দেশনা বুঝতে পারিনি জনাব। দয়া করে বাংলায়

পুনরাবৃত্তি করুন।’

নির্দেশনা না বুঝলে একই রেকর্ড বাজাতেই থাকবে। বিজ্ঞানীর মাথায় হাত। এত দিনের পরিশ্রম বুঝি...। ‘আরে! এ তো বাংলা ছাড়া বুঝবে না!’ ভুল বুঝতে পেরে আবার আবেগতাড়িত হয়ে গেলেন বিজ্ঞানী। সঙ্গে সঙ্গে গলা পরিষ্কার করে বললেন, ‘বযো, আমাকে এক পেয়ালা পানি দাও।’

‘আজ্ঞে জনাব। এখুনি দিচ্ছি।’

গ্লাস যে ইংরেজি শব্দ ভুলেই গিয়েছিলেন বিজ্ঞানী মতিন!

২

বয-১ কে নিয়ে সারা দেশে হইচই। বিশ্বের প্রথম বাংলা রোবটটা যা বলে তাই করে। বাংলায় বললেই হলো। সবার একটা করে চাই-ই। বিজ্ঞানীর কাছ থেকে যন্ত্রটার মেধাসত্ত্ব কিনে নিল একটা কোম্পানি। এক মাসের মধ্যে দেশের সবার বাসায় চলে গেল একটা করে বয-১।

৩

দুই দিনের মধ্য দেশজুড়ে হই হই রই রই। বয-১ নাকি কথা শুনছে না! কোম্পানি বিরক্ত হয়ে সবাইকে বলে দিল, যা বলার বিজ্ঞানী মতিনকে বলুন। উনিই সমাধান দেবেন।

বিজ্ঞানী বজলুকে ফোন করলেন এক তরুণী।

‘উফ, স্যার, আপনাড় ড়োবটটা একটুও কথা শুনছে না। হোয়াট দ্য হেল। একটু আগেই বললাম, প্লিজ মার্কেটে গিয়ে একটা আই লাইনার নিয়ে আসো। শুনলোই না!’

বিজ্ঞানী মতিন ভাবলেন। তারপর বললেন, ‘খুকি এক কাজ করো। ওকে বলো, অনুগ্রহ করে বাজারে গিয়ে একটা চোখের রেখা অঙ্কন প্রসাধনী নিয়ে আসো, দেখো ঠিক কাজ করবে। ও তো ইংরেজি বোঝে না..।’

‘উফ শিট ম্যান! এসব কী কথা! তা এখন যদি আমার ফ্রায়েড রাইস আর চিকেন খেতে মন চায়, দেন হোয়াট শ্যুড আই সে?’

আচমকা কেন জানি মেজাজ খারাপ হয়ে গেল বিজ্ঞানী মতিনের। মনের একটা অংশ বলছে, উচিৎ কাজটাই করেছি! কিন্তু মেজাজ কিঞ্চিৎ সামলে নিয়ে বললেন, ‘তা হলে বলতে হবে, বাবা যন্ত্রমানব, তুমি দ্রুতগতির খাবারের দোকান হইতে ভাজা ভাত আর মুরগি নিয়ে আসো।’

‘ওহ ড্যাম। হাউ ক্যান আই.. ওহ.. লেট মি ট্রাই।’

লাইন কেটে দেবেন, এমন সময় আবার ফোন। এবার একটু বয়স্ক কণ্ঠ।

‘ইয়ে কদিন ধরে পায়ে ব্যথা। রোবটটাকে বললাম ভাই একটু মাসাজ করে দাও। শুনলোই না।’

'বলুন, পা মর্দন করে দিতে। আর না হয় দলাই মলাই করে দিতে। আর না হয় বলুন পা দুটোকে ভর্তা বানিয়ে দাও।'

শেষের কথাটা বিজ্ঞানী রাগ করেই বলেছেন। রাগ না কমতেই আরেক তরুণের ফোন।

'ইয়ো ডুড, বযকে বললাম ব্রেকফাস্ট বানাতে, দিল না। লাঞ্চটাও হলো না। একটা ফানি জোকস বলতে বললাম, সেটাও করলো না। ইটস নট ফানি ম্যান। আমি আমার টাকা রিটার্ন চাই।'

'ব্যাটা সকালের নাস্তা আর দুপুরের খাবার বলতে কি তোর দাঁত ভাইঙ্গা যায়!' মেজাজ নিয়ন্ত্রণ হারালো এবার। 'আর আমার এই রোবট খাঁটি বাঙালি, তোর ওই ডুড ফুড মার্কা কথা হ্যায় বোঝে না। বাংলা কইতে পারলে সার্ভিস পাবি, আর না হয় পুশকুনিতে ডুব দে।'

'ওহ হেল! বাই দ্য ওয়ে, হোয়াট ইজ পুশকুনি ম্যান?'

এভাবে দিনভর প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে মহাবিরক্ত বিজ্ঞানী যে-ই না ফোনটাকে আছাড় দিতে যাবেন অমনি ফোন এলো কেন্দ্রীয় ভাষা একাডেমি থেকে। ফোন করেছেন স্বয়ং মহাপরিচালক।

'হ্যালো মতিন সাহেব! আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাই! আপনি একটা মহা আবিষ্কার করে ফেলেছেন মশাই! গত দশ বছরে আজই প্রথম অভিধান বিক্রি হলো। আপনার রোবটকে নির্দেশনা দিতে নাকি বাঙলা অভিধানের বিকল্প

নেই। উফ একটা কাজ করেছেন মশাই!’

আবেগে আবারো চোখ টলোমলো বিজ্ঞানী মতিনের।

৪

এক সপ্তাহ না যেতেই কয়েক লাখ বাংলা অভিধান বিক্রি হয়ে গেল। প্রথমে ক্রেতারা যতই বিরক্ত হোক না কেন, বয-১ কে আসলে কেউ হাতছাড়া করতে রাজি নয়। এ জন্য শুদ্ধ বাংলা শিখে নিচ্ছে সবাই।

ধীরে ধীরে গোটা বাংলাদেশে সবার বাংলা ভাষা শেখা হয়ে গেল। আগে যে টুকটাক কথায় ইংরেজি চলে আসতো, সেটাও এখন বন্ধ। ইংরেজি মাধ্যমে পড়ুয়া সুদর্শন তরুণীটি এখন রাস্তায় বিলেতি কুকুরছানা দেখে চিৎকার করে বলে ওঠে, ‘ওহ কুকুরছানাটা কী আদর আর নরম!' (কথাটা হবে আদুরে আর তুলতুলে)। তরুণরা এখন রাস্তায় রূপবতী কাউকে দেখলে বন্ধুদের কানে কানে বলে, ‘বন্ধু, মেয়েটা খুব শীতল, তাই না রে!’ (কুল এর বাংলা তো শীতলই)। বিজ্ঞাপনের ভাষাও বদলে গেল। টিভি ছাড়তেই শোনা যায়, ‘বন্ধু ছাড়া জীবন অসম্ভব.. দূরালাপনীতে যত বেশি ব্যয় করবেন, ততই অতিরিক্ত পাবেন.. আমরাই প্রথম নিয়ে এলাম দিবারাত্রির বিশেষ বোঁচকা প্রস্তাব...।'

৫

বয-১ চলে গেছে সুদূর আমেরিকার বাজারে। একজনের দেখাদেখি অনেকে কিনছে রোবটটা। অনেক কসরত করে নির্দেশনা দিতে হলেও ওরা খুশি। এত কম খরচে এত কাজের যন্ত্র ওরা আগে দেখেনি। এক রোবট দিয়েই বিশ্ব চিনে গেল বাঙালিকে। এমনকি বাংলাও শিখতে হচ্ছে তাদের। অবশ্য টুকটাক কাজের কথাগুলোই শিখছে তারা। এই যেমন বাজার হইতে এক সের চিচিঙ্গা লইয়া বাড়িতে ফিরিয়া আসো।

৬

কয়েক বছর পর। আমেরিকান ভাষাবিদ ও কলাম লেখক ডেভিড নোলানের কপালে চিন্তার ভাঁজ। পত্রিকার জন্য মন্তব্য প্রতিবেদন লিখতে বসেছেন। বিষয়- আমাদের ভাষায় বাংলার আধিপত্য। ইংরেজিতে তিনি যা লিখছেন তার অনুবাদ করলে দাঁড়ায়-

'ইদানীংকার তরুণ সমাজের ভাষা নিয়া আমি বড়ই চিন্তিত। কদিন ধরে খেয়াল করছি ওরা কথায় কথায় বাংলা বলে ফেলছে। এভাবে চলতে থাকলে ইংরেজি ভাষার ঐতিহ্য ও দীর্ঘদিনের সংস্কৃতি... ।'

বৃষ্টিবিলাস ২১১৫

সকালে ঘুম থেকে উঠতেই একগাদা খারাপ খবর শোনায় বকবক-২.০। আজও যথারীতি হাই তুলতে তুলতে খবরগুলো শুনলেন হিলিয়াম মিয়া।

খবর-১ : শহরের আরো দুটো গলি পরিত্যক্ত ঘোষণা। খবর-২: উত্তরের নগরীর একটি প্রধান সড়কে পুকুর হয়ে গেছে। তেলাপিয়া মাছ চাষের অপার সম্ভাবনা। খবর-৩: সবার জন্য বৃষ্টি চাই অ্যাসোসিয়েশনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে রোবোপুলিশের হামলা। খবর-৪: বঙ্গোপসাগরের পানি দূষণ চরম মাত্রায়। সেন্ট মার্টিন দ্বীপ থেকে ট্যানারি কারখানা সরানোর দাবি পরিবেশবাদীদের।

‘থাম এবার! যথেষ্ট!’

বকবক ২.০ চুপ করলো। হালকা কাশিও দিল। উসখুস করছে কোনো কারণে।

‘সাত সকালে এত খারাপ খবর শুনতে চাই না। একশ বছর আগের ঢাকার নিউজ শোনা। একটু হাইসা লই।’

‘একখান কথা স্যার। রোবট হইছি বইলা তুই তোকারি করবেন না। আমার ইদানীং ভাব আসে।’

‘বদ রোবট! যা করতে বলছি কর! নইলে তোর এ মাসের চার্জ বাতিল।’

রোবট বলতে শুরু করলো। একশ বছর আগের খবর-

তীব্র যানজটে নাকাল নগরবাসী। গাবতলী থেকে মতিঝিল যেতে তিন ঘণ্টা। খানাখন্দে পানি জমে একাকার।

প্রথম নিউজটা শুনেই পেট আর গা দুলিয়ে হেসে উঠলেন হিলিয়াম মিয়া। আরেকটু হলে উড়েই যেতেন। সকালে এভাবে গা দুলিয়ে হাসলে বাথরুম ভালো হয়। নিজেই নিজেকে বললেন, 'নগরবাসী নাকি নাকাল! তিন ঘণ্টা একটা সময় হইল! এখনকার দুনিয়ায় আসলে কী হইতো ওগো! নগরীতে যান আছে জট নাই। তারওপর খানাখন্দ কি খারাপ নাকি! রাস্তা আছে এটাই তো বড় কথা! কী বোকা ছিল মানুষগুলা।'

'জ্বি স্যার একদম ঠিক বলেছেন। শহরের রাস্তাঘাটে এখন সব মরা গাড়ি। গাড়ির পর গাড়ি। ড্রাইভার নাই। যাত্রী নাই। তেল নাই গ্যাস নাই। আছে শুধু গাড়ি আর গাড়ি। এ যে বাড়াবাড়ি। স্যার আমি তো কবি হয়ে যাচ্ছি! আপনি যদি আমাকে ব্যাটারি রিচার্জ করে দেন তবে একটা দুটো নোবেল...।'

'মানুষের মুখে মুখে তর্ক করবানা বকবক ২.০! ও তোর নামই তো বকবক, হে হে হে।'

'জ্বি স্যার, কথা বলা ছাড়া এখনকার রোবটকূলের আর কী-ই বা করার আছে। তা যাক গে। পরের খবরের শিরোনাম- নগরীতে প্রথম বর্ষা, বৃষ্টিতে যে ৬টি কাজ করতেই হবে।

খবরটা শুনে মনটা আবার তেতো হয়ে গেল হিলিয়াম মিয়ার। একশ বছর আগের একটা অনলাইন পোর্টালের নিউজটা পড়ে তার জানার খুব ইচ্ছে হলো-বর্ষায় কোন ৬টি কাজ তাকে করতেই হবে। তবে মন খারাপ ভাবটা গেল না। কারণ একটাই। নগরীর এ দিকটায় বর্ষা গায়েব। বৃষ্টির দেখা নেই গত কয়েক বছর। মেঘ অধিদপ্তর ঘুষ ছাড়া কোনো কাজ করে না। উত্তরের সেক্টরগুলোতে মাসে একবার করে বৃষ্টি, অথচ দক্ষিণে এক ফোঁটা মেঘের দেখা নেই। মেঘ তৈরি হলেই সেগুলোকে মেগা বিমানের ফ্যান দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বিশেষ এলাকায়। সেখানে চলে বর্ষাবিলাস। ভাবতেই রাতে গা চিড়বিড় করে হিলিয়াম মিয়ার।

দশটা অ্যাপার্টমেন্টের ছাদ টপকে একটা জীর্ণ ফ্লাইওভারের ওপর দাঁড়িয়ে নিচের রাস্তার দেখা পেলেন। শহরজুড়ে ভাঙাচোরা গাড়ির জঞ্জাল। রাস্তায় সারি সারি গাড়ি। বাড়ির ছাদ আর ফ্লাইওভার টপকে যা একটু হাঁটাচলা করা যায়। ছোটবেলায় তাও রাস্তায় হাঁটতে পারতেন। কিন্তু বিদেশ থেকে পুরনো গাড়ি ফ্রিতে নেওয়ার চুক্তি করেই ধরাটা খেয়েছে সরকার। এখন চুক্তি অনুযায়ী চালক থাকুক বা না থাকুক, গাড়িগুলো নিতেই হবে।

এদিকটায় নতুন এসেছেন। ঠিক করেছেন একটু ঘুরেফিরে দেখবেন। বিয়ে করেননি। পরিবারেও কেউ নেই। সঙ্গী বলতে একটা বকবক রোবট।

‘স্যার চলেন ফার্নিচারবাগে চাই। কিছু গাছ দেখে আসি।’

‘এই সব মরা মরা গাছ আর কতো দেখবো। ফুল নাই পাখি নাই। আইচ্ছা ওই জায়গার নাম ফার্নিচারবাগ হইল কেন? ওইখানে তো বিশাল খাদ।’

‘পঞ্চাশ বৎসর আগে ওই এলাকায় দামি দামি ফার্নিচার বেচা হইতো স্যার। নাকি স্যার চাইনিজমন্ডিতে যাবেন?’

‘নারে, তারচেয়ে বরং অতি-পুরান ঢাকায় যাই। সেখানে একটা ঐতিহাসিক মোঘল কার-পার্কিং পাওয়া গেছে নাকি। ওইটার সঙ্গে অলফি তুলে আসি (৩৬০ ডিগ্রি পদ্ধতিতে সবকিছুসহ ছবি তোলা)।’

আকাশে গুড় গুড় শব্দ শুনে উপরে তাকালেন হিলিয়াম মিয়া। মেঘ জমতে না জমতেই সেগুলোকে মেগা-বিমানের ফ্যান তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে শহরের আরেক কোণায়। ওদিকে যাওয়ার ভিসা নেই তার। কারণ তিনি অত টাকা ট্যাক্স দেন না। যে টাকা ছিল সব পড়াশোনাতেই চলে গেছে। মাটি থেকে সোজা উঠে যাওয়া একটি পাইপের নল খুলে গলা ভিজিয়ে নিলেন খানিকটা। এরপর একটা সিঁড়ি দেখে তরতর করে নেমে এলেন নিচে। গাড়ির এক ছাদ থেকে আরেক ছাদে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটবেন ঠিক করেছেন।

‘স্যার মাথায় একটা বদ বুদ্ধি আসছে। অনুমতি দিলে বলি।’

‘অনুমতি দিলাম না। তোর বদ বুদ্ধি মানে ট্রাফিক পুলিশের লগে ঘুষ ঘুষ খেলা (দূর থেকে উড়ন্ত ট্রাফিককে মুঠো পাকিয়ে দেখাতে হবে। তারা ভাববে মুঠোভর্তি ঘুষের টাকা। ওটা

নেওয়ার জন্য নিচে নামতেই মুঠো খুলে টা টা দেখানো হবে)’

‘না স্যার। একটা অনলাইন নিউজপেপার খুলেছি কয়দিন আগে। ভাল হিট হইতাসে। আপনে অনুমতি দিলে ওইটাতে একটা নিউজ আপলোড কইরা দিই।’

বিরক্তির পাশাপাশি খানিকটা পূলকও বোধ করলেন হিলিয়াম মিয়া। বকবক গোত্রের রোবট বলে মাফ করলেন।

‘যা খুশি কর। উল্টাপাল্টা কিছু লিখিস না। তাইলে আবার ঢাকার ভিসা বাতিল হইয়া যাইবো।’

‘নিউজটা পুস্ট করলে স্যার কেয়ামত ঘইটা যাইতে পারে। কারণ মানুষ বইপুস্তকের চেয়ে অনলাইন নিউজরে বেশি বিশ্বাস করে।’

‘তোর যা মন চায় কর।’

‘জো হুকুম জাহাপনা। দিলাম লিখা।’

রোবটের লিখতে লাগলো এক ন্যানো সেকেন্ড, পোস্ট হতে এক সেকেন্ড। এরপর কেটে গেল আধ ঘণ্টা। ততক্ষণে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছেন ব্যাংকঝিল নামের একটা জায়গায়। এদিকে গাড়ির স্তূপ সবচেয়ে উঁচু। শ্যাওলা পড়া একটা সেভেন সিরিজের বিএমডাব্লিউর ওপর দাঁড়িয়ে আছেন হিলিয়াম মিয়া। আকাশের গুড় গুড় শব্দটা আচমকা বন্ধ হয়ে গেছে। উপরে তাকিয়ে দেখলেন মেঘগুলো সরছে না। ধীরে ধীরে পিছু হটছে মেগা বিমানগুলো। ওগুলোর

পাখাও বন্ধ। মাথার উপর কালো মেঘের দল ঠায় দাঁড়িয়ে। একি! বৃষ্টি হবে নাকি! গুড় গুড় গুড়। ঝির ঝির। হিলিয়াম মিয়া হা করে উপরে তাকিয়ে আছেন। ঝমঝম বৃষ্টি!

‘স্যার.. চলেন কোথাও দাঁড়াই। বেশি ভিজলে ঠাণ্ডা লাগবো।’

‘আরে থাম! কী ঘটাই দিলি তুই!’

‘কিছু না স্যার একটা নিউজ দিসি।’

‘ওরে আমার বকবক! শিরোনামটা পড়ে শোনা।’

‘বাংলার আকাশে চীনের তৈরি কৃত্রিম মেঘ! রাসায়নিক বৃষ্টির আশঙ্কা! স্যার.. ওই দিকের লোকজন ভয় পায় বেশি। ওরা ভাবসে এই মেঘের বৃষ্টি গায়ে লাগলে না জানি কী বিপদ। হে হে হে।’

হিলিয়াম মিয়ার মনে হলো তার নামটা এতদিনে সার্থক হয়েছে। এই বুঝি উড়ে যাবেন। নিজেকে পাখির মতো হাল্কা লাগছে। জঞ্জালের স্তূপে দাঁড়িয়ে রোবটসঙ্গীর সঙ্গে বৃষ্টিবিলাস মন্দ লাগছে না তার।

ঢাকায় পতন

পটভূমি: একশ বছর আগে বিজ্ঞানীরা অ্যান্টি-গ্র্যাভিটন কণা আবিষ্কার করেছেন। পৃথিবীতে তোলপাড়। এই কণা ভেসে থাকতে পারে! ব্যবিলনের মতো সেই সুদূর বিলোনিয়াতেও বানানো হলো শূন্য উদ্যান। শূন্যে ভেসে থাকা নগর গড়ে উঠতে লাগলো একের পর এক। মানুষের আর মাটিতে পা-ই পড়ে না। যথারীতি ঢাকার ওপর গড়ে উঠলো আরেক শহর। নগরবাসী যে শহরের নাম দিল 'খোলা'। তারপর একদিন...।

‘উঁহু রিশান! তোমাকে না কত্তবার বলেছি রিসাইকেল মেশিন ব্যবহার না করতে। ময়লা-আবর্জনা থেকে আমাদের কিচ্ছু বানানোর দরকার নেই। নিচে এত্তবড় একটা ডাস্টবিন আছে, ওখানেই ফেলো।’

'কিন্তু মা, নিচের শহরটা..।'

‘ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে সোজা ঢাকায় ফেলে দাও। আর ওটা শহর কে বলেছে! ঢাকা এখন আমাদের ডাস্টবিন!’

ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে নিচে তাকালো রিশান। উঁচু উঁচু ভবনের মাথা দেখা যাচ্ছে। কোনো ভবনের ছাদে তরকারির খোসার স্তূপ, আবার কোনোটার ওপর ইয়ে..। যে যেখানে খুশি ময়লা ফেলছে। নিচে তো কেউ থাকে না। কিন্তু ছোট্ট রিশানের মন এতে সায় দেয় না। সে ঠিক করেছে এ নিয়ে খোলা শহরের মেয়রের সঙ্গে আলাপ করবে। স্মার্টফোনকে বলতেই যোগাযোগ ঘটিয়ে দিল।

‘হ্যালো বাবু, কওছাইন তোমার লাগি কিতা খরতাম ফারি।’
‘আমার জন্য না, আপনি ঢাকার জন্য করেন। নিচের শহরটা তো একেবারে সুয়ারেজ লাইন হয়ে গেছে।’
‘আমি নয়া খরি আর কিতা করলাম কওছাইন। আমরার চৌদ্দ ছিড়িয়ে ঝেলা রাখিয়া গেছইন, আমরা অলাও রাখসি (আমার পূর্বপুরুষেরা যেমন রেখে গেছে তেমনই রেখেছি)। এই উদলা শহররে সুন্দর রাখার লাগি আর কিতাউ বা খরা যায় (এই খোলা শহরকে সুন্দর রাখতে আর কি-ইবা করার আছে)। রিসাইকেল খরিয়া অতো অতো টাইম লস করবার সময় খানো, তুমি খও।’
রিশানের মনে হলো কাজটা ঠিক হচ্ছে না। এদিকে দাদাভাইটা যে কোথায় গেল।
রিশানের প্রায় শতবর্ষী দাদাভাই খোলা নগরীর একটা চকচকে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন। কোথাও এক ফোঁটা ময়লা আবর্জনা নেই। সবকিছুতে সিনথেটিক ভাব। আচমকা তার শৈশবের ফেলে আসা ঢাকার কথা মনে পড়ে গেল। কত ময়লা! কত কাক! ডোবা নালা! যত্রতত্র মলমূত্র। হঠাৎ একটা ভবনের দেয়ালে চোখ আটকে গেল। বড় বড় করে লেখা, এখানে প্রসাব করিলে সোয়া দুই লাখ টাকা জরিমানা। ‘আহা, দিন কত বদলেছে’ ভাবছেন রিশানের দাদা (যদিও ভুল বানানটা বদলেনি)।
হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মনে হলো সব কিছু কেমন যেন হাল্কা হয়ে গেল। নিজের ওজনটাও ধপ করে অনেকখানি কমে গেল। একটু পরই আবার স্বাভাবিক। দ্রুত বাসার দিকে হাঁটলেন। আকাশকম্প হয়েছে নির্ঘাৎ।

বাসায় ঢুকেই টেলিভিশন ছাড়লেন। নতুন শহরে চ্যানেল একটাই। চ্যানেল মালিকরা একজোট হয়ে একটাই স্টেশন বানিয়েছে। বিজ্ঞাপনের আয় সবাই ভাগাভাগি করে নেবে। খরচ কম, আয় আগের মতোই।

অ্যান্টি-গ্র্যাভিটনের বানানো চেয়ারে বসে টক শো হচ্ছে। সবাই উড়ে উড়ে কথা বলছেন। অতিথির আসনে রোবটের মতো গম্ভীর মুখে বসে আছেন একজন।

উপস্থাপক: দর্শক এইমাত্র খবর এসেছে খোলা নগরী আরও দুই ইঞ্চি নিচে নেমে গেছে। এই নিয়ে এ বছর আমরা এক ফুট নিচে নামলাম। জনাব সিডিসি, দেশের স্বনামধন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশিষ্ট কম্পিউটার হিসেবে আপনার কী মত?

সিডিসি: আসলে নিচে নেমেছে না বলে, বলুন দুই ইঞ্চি পতন হয়েছে। এই খোলাবাসী যতই উঁচুতে উঠেছে, আসলে ততই নিচে নেমেছে। আপনাদের ভুলে গেলে চলবে না যে সব কিছুরই শেষ আছে। নিচের শহরটাকে ময়লা করতে করতে ডাস্টবিন বানিয়েছেন। দূষণের ফ্যাক্টরি। মানুষ তো দূরে থাক, আমাদের রোবটদেরও প্রসেসর-অ্যাটাক হচ্ছিল। তো এখন অ্যান্টি-গ্র্যাভিটনেরও তো একটা মেয়াদ আছে। কথা ছিল একশ বছরে কিছু হবে না। তো..এটাকেই নগরের শাসকরা ধরে নিয়েছিলেন আজীবন। একশ বছর মানে তো আজীবন না! গ্র্যাভিটনের মেয়াদ শেষ, এখন শহর দেখবেন রাতারাতি আবার নিচে নেবে আসবে। তখন... ।'

রোবট অতিথির কথা শেষ না হতেই শোঁ শোঁ বুমম। এবার নির্ঘাৎ এক মিটার নিচে নেমে এসেছে।

শোঁ শোঁ... ধপ। মুহূর্তে খোলা শহরে আতঙ্কের সাইরেন

বেজে উঠলো। লোকজন সব রাস্তায়। খোলা শহরটা নামছে তো নামছেই। মৃতনগরী ঢাকার অলিগলি এখন স্পষ্ট। আস্ত একটা শহর এসে ঢেকে দিচ্ছে ঢাকাকে। মেয়র জরুরি ভাষণ দেওয়া শুরু করেছেন- ভাইসব, বোনসব। আপনারা কেউ আতঙ্কিত হইবেন না। মইলার গন্ধ নাকে আসিলে নাকের গুরায় রুমাল দিয়া চাপিয়া ধরিবেন। বাইরে বেশি গুরাগুরি করিবেন না..।

এদিকে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে রিশান। 'দাদা! ঢাকা আরও কাছে চলে এসেছে! দেখো দেখো! একটা ফুল! কত্ত বড় শাপলা!'

রিশানের দাদা দূরের জিনিস দেখতে পান না। তবে মতিঝিলের সেই শাপলাটাকে স্পষ্ট চিনতে পারলেন। আহা! শাপলা চত্বর! ফুলটা কত মলিন হয়ে গেছেরে! বুকের ভেতর হু হু করে উঠলো তার। ইচ্ছে হলো চশমা মোছার রুমালটা দিয়ে ফুলটাকে একটু মুছে দিয়ে আসেন। নিজে থাকতেন মিরপুরে। তারপরও মতিঝিল কত আপন! পতন নিয়ে অনেককে পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে দেখলেও পরে দেখা গেল সবাই বেশ খুশি খুশি। ময়লা পুঁতিগন্ধময় ঢাকাকে সাফসুতরো করতে মেয়রকে কিছু বলতে হলো না। সবাই নিজ দায়িত্বেই ঝাড়ু হাতে নেমে গেল।

দূর আষাঢ়ের গল্প

বর্ষার প্রথম দিনেই মেজাজ বিগড়ানো খবর। বৃষ্টির দাম আবারো বাড়িয়েছে সরকার। মিনিট প্রতি সাড়ে তিনশ টাকা। ‘নাহ, এই বর্ষায় আর বৃষ্টি কেনা যাবে না। চুলোয় যাক বরফগলা পাউডার মেশানো পানি!’ গজগজ করতে করতে ছাতা হাতে নিতে যাচ্ছিলেন সাত্তার মন্ডল। তার আগেই ছাতাটা লাফিয়ে উঠে বলল, ‘কইরছেন কী ছার! বাদলা নাই মেঘ নাই, আফনে আমারে নিতাসেন ক্যালা!’

‘ছাতার মাথা! যা ভাগ!’

ছাতার ওপর মেজাজ দেখানো ছাড়া আর কীই বা করার আছে। বছরের একটা মাস এক পশলা বৃষ্টির শখ করে মেয়ে দুটো। সেটা কেনারও জো নেই। ইচ্ছে করছে একেবারে ব্যাংক লোন নিয়ে ইচ্ছেমতো এক মাস বৃষ্টিতে ভিজবেন। কিন্তু ইচ্ছেটা আপাতত বুক পকেটে গুঁজে রেখে বেরিয়ে পড়লেন বাজারের ব্যাগ হাতে।

বের হতেই পাশের বাড়ির মফিজুদ্দিন দাঁত কেলিয়ে হাসলো। ‘কী হে সাত্তার মন্ডল, গত মাসের বৃষ্টির বিল শোধ হয় নাই বুঝি। তা আসো একদিন আমার ছাদে, ফ্রি তে একটু ভিজা যাও।’ মফিজুদ্দিন তার বউকে নিয়ে ছাদে বৃষ্টিতে ভিজছে। পুরো কাকভেজা হয়ে আছে। কী অপচয়! আবার কিপটের হাড্ডিও। একফোঁটা ঝাপটাও বাইরে পড়ার জো নেই। ভিআইপি লাইনের বৃষ্টি বলে কথা। এদিকে সাত্তার মন্ডলের মাথার ওপর গনগনে সূর্য। একদলা থুথু ফেলে গজগজ

করলেন আবারো, ‘সব মেঘ ভিআইপির দখলে। দেশটা খাইসে, এইবার মেঘটাও খাইল। নাহ, আইজকাই লোন নিমু।’

দুই পা না এগোতেই থেমে যেতে হলো। বৃষ্টি বিভাগের স্পেশাল ইউনিটের গাড়ি তার সামনে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলো। সেমি অটোমেটিক হাতে দুজন অফিসার নামলো গাড়ি থেকে। দুজনের একজন সাত্তার মন্ডলের দিকে ঝট করে এগিয়ে দিল বিলের কাগজ। ‘স্যার, গত বছরের বকেয়া বাবদ দুই লক্ষ পঞ্চান্ন টাকা হয়েছে। বিলটা শোধ করুন। তা না হলে গুলি করতে বাধ্য থাকবো।’

সাত্তার মন্ডল ঘাবড়ে গেলেন না। পরিচিত দৃশ্য। ‘দেখুন কোনো ভুল হয়েছে আপনাদের। আমার বিল কখনই সোয়া তিন হাজারের বেশি আসে না। এত টাকা ওঠার প্রশ্নই আসে না। আমার ছাদটাও ছোট।’

‘আগে বিল শোধ করুন, পরে অভিযোগ দেখা হবে।’

লোক দুটোর নিস্পৃহ দৃষ্টি দেখে সাত্তার মন্ডল বুঝে নিলেন, উপায় নেই। তবে গড়বড়টা ধরতে পারলেন না। বন্দুকের ইশারা করতেই এগিয়ে দিলেন ক্রেডিট কার্ড।

বাসায় ফেরার পরও ঘোর কাটেনি সাত্তার মন্ডলের। একের পর এক চ্যানেল পাল্টাচ্ছেন। তিনশ চ্যানেলের সবকটাতেই আষাঢ়ের খবর। সবাই যার যার বাসার ছাদে সুইচ টিপে টিপে বৃষ্টিতে ভিজে নিচ্ছে আর প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে। তরুণীরা অনলাইনে কদম ফুলের অর্ডার দিচ্ছে আর একটু পরপর ছাদে গিয়ে সুইচ টিপে একটু আধটু ভিজছে। দুয়েকটা টোকাইকে দেখা গেল বুভুক্ষের মতো হা করে ওপরের দিকে

মুখ করে আছে। সামান্য ঝাপটা যদি এসে পড়ে। সাত্তার মন্ডল আপাতত কিছু ভাবছেন বলে মনে হলো না। তবে একটি চ্যানেলে এসেই তার হাত আটকে গেল। অভিনব কায়দায় বৃষ্টি চুরি নিয়ে একটা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন দেখানো হচ্ছে। বৃষ্টির অবৈধ লাইনে ছেয়ে গেছে রাজধানীর আকাশ। অনেকের ছাদ বরাবর বাড়তি রেইন কালেক্টর লাইন বসিয়ে দেয়া হয়েছে। একজনের বৃষ্টি চলে যাচ্ছে অন্যের ছাদে। দেখতে দেখতে হুট করে সাত্তার মন্ডলের চোখ আটকে গেল একটা বাড়ির দিকে। আরে! এতো তারই বাড়ি। ক্যামেরা উঠে গেল সোজা ছাদ বরাবর আকাশে। বিস্ময়ে বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গেল সাত্তার মন্ডলের গলা। তার লাইন দিয়ে অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে। কিন্তু মাঝপথে পানি সব চলে যাচ্ছে অন্তত হাজার খানেক পাইপলাইনে। প্রতিবেদক বলেই যাচ্ছে, 'এই বাড়ির বৃষ্টির লাইনটাকে ভিআইপি করা হয়েছে বছর পাঁচেক আগে। অথচ বাড়ির মালিক সেটা টেরই পাননি। সারাবছরই টানা বৃষ্টি হতো এ বাড়ির ছাদে। কিন্তু বাড়ির মালিক জানতেন না কী করে চুরি হয়ে যাচ্ছে তার বৃষ্টির পানি। কী করে তাকে নিঃস্ব করে দিচ্ছে একদল দুষ্কৃতিকারী। প্রশ্ন হলো, কোথায় যাচ্ছে এই পানি? কারা ঘটাচ্ছে বৃষ্টি চুরি? উত্তর আমাদের কাছেই আছে। তার আগে নিচ্ছি এক মাসের ছোট্ট একটা বিরতি। ততক্ষণ ভিজতে থাকুন বাদল দিনের প্রথম বৃষ্টিতে।

একশ বছর আগের সায়েন্স ফিকশন

লেখকের নাম সম্মোহন গাঙ্গুলী। স্বাক্ষরের নিচে তারিখ- দশ আষাঢ়, ১৩২২ বাং। প্রায় একশ বছর আগের! বন্ধুর দাদার পুরনো আলমিরাতে রাখা আরো অনেক নথিপত্র থাকলেও আমার নজরে এলো পাণ্ডুলিপিটা। অনেকগুলো ছোট গল্প। এর মধ্যে একটার শুরুতেই লেখা 'ইংরেজি সন দুই সহস্র পনের, ১৪২২ বঙ্গাব্দ। মানবজাতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। দুনিয়াদারির নিদারুণ বদল।' বলে কী! সম্মোহন গাঙ্গুলী সায়েন্স ফিকশন গল্প লিখতেন! এটাই কি তবে বাংলায় লেখা প্রথম সায়েন্স ফিকশন? দেখি তো পড়ে...(চলতি ভাষায় রূপান্তরিত)

"দুনিয়াদারির নিদারুণ বদল। বদলালো না কেবল তেলেসমাতি ভট্টাচার্যের জীবন। ছেলে তরঙ্গ ভট্টাচার্য ও মেয়ে শ্রীমতি ইঞ্জিনাকে নিয়ে আছেন দারুণ বিপাকে। এরা বড় বেশি যন্ত্রবান্ধব হয়ে পড়েছে। এদেরকে নানাবিধ যন্ত্র কিনে দিতে দিতে তেলেসমাতির জীবন পানসে হয়ে গেছে। এ সময় তাকে উদ্ধার করতে আষাঢ়ের একদিন তরঙ্গদের মামা মঙ্গলাচার্য এসে হাজির। বিলেত থেকে ব্যাগ ভর্তি যন্ত্রপাতি আর জিনিসপত্র এনেছেন।

তরঙ্গের তর সইল না। মামা আমার জন্য কী এনেছো? মঙ্গলাচার্যের মুখে রহস্য হাসি। বললেন, শুধু তোর জন্য নয়রে। গোটা গ্রামবাসীর জন্য অনেক কিছু নিয়ে এসেছি। সবই বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার।

ভাগ্নের হাতে তুলে দিলেন একটা ছোট যন্ত্র বিশেষ। ‘এটা নতুন রেডিও। এটা দিয়ে অন্য আরেকজনের সঙ্গে কথা বলতে পারবি। কথা বললেই দেখবি তোর অনেক অনেক বন্ধু হয়ে গেছে। এই বন্ধুরা তোর জীবনের সব কিছু। পরিবারের ধার না ধারলেও চলবে। ধরিত্রীর যত সমস্যা, যত অন্যায়, যত অনাচার, অত্যাচার, সব সমস্যার সমাধান দেবে এই যন্ত্র। তরঙ্গ জানতে চাইল, এটা কিভাবে কাজ করবে? মামার উত্তর- এতে নম্বর আছে। নম্বর দাগাতে হবে। তারপর দেখ কী হয়!

ইঞ্জিনার জন্য তার মামা বিশেষ এক মলম নিয়ে এসেছেন। ইঞ্জিনা শ্যামলা বর্ণের। এ নিয়ে তার আক্ষেপের কমতি ছিল না। অবশ্য তার বান্ধবীরাও রূপ নিয়ে বেশ সচেতন। পৃথিবীর দিকে একটা গ্রহাণু ছুটে আসার খবর তারা রেডিওতে দেখেছে (এখনকার রেডিওতে শব্দের পাশাপাশি ছবিও দেখা যায়)। কিন্তু ও নিয়ে তারা এখন ভাবে না। ভাবনার বিষয় এখন একটাই। সেটা হলো গাত্রবর্ণ। মাঝে মাঝে নাকের পাশে গজিয়ে ওঠা ছোট্ট ফুসকুড়িও তাদের স্থানকাল ভুলিয়ে দেয়। কিন্তু মামার আনা মলম জাদুর মতো কাজ করলো। এক ঘণ্টার মধ্যে শ্যামলা শ্রীমতি ইঞ্জিনা হয়ে গেল ধপধপে ফর্সা। নাকের ফুসকুড়িও গায়েব। দুদিনের মধ্যে তেলেসমাতি ভট্টাচার্যের বৈদ্যুতিক ডাকবাক্সে একটা বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাম আসলো শ্রীমতি ইঞ্জিনার নামে। ঢাকার একটা বড় কোম্পানি তাকে লিখেছে, ‘আপনার চেহারা ফর্সা হইবার কারণে আপনাকে নিয়োগ দেওয়া হইল। কাম শার্প। আর্জেন্ট।’ এখন ইঞ্জিনা নতুন করে আর কী নিয়ে টেনশন করবে সেটা

বুঝতে না পেরে পুনরায় দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত হলো।

এদিকে তরঙ্গ তার যন্ত্রখানার নম্বর টিপলো। কী ভোজবাজি! ওই দিনই তার দশটা বন্ধু হয়ে গেল। ওই বন্ধুদের ছাড়া তার জীবন অসম্ভব হয়ে গেল। এরপর ওই যন্ত্র টিপে টিপেই সে তার আশপাশে যত সমস্যা দেখলো, সব কিছুর সমাধান করে ফেলল। যন্ত্র নিয়েই তার দিন কাটে। যে কেউ যেকোনও সমস্যা নিয়ে আসলে সে যন্ত্রের নম্বর টিপে টিপে সমাধান করে দেয়।

তেলেসমাতির ছোট ভাইয়ের ছেলেটা রোগাসোগা। রোগের কারণে স্কুলেও ভাল ফল করছিল না। মঙ্গলাচার্য তার জন্যে নিয়ে এসেছেন এক অত্যাশ্চর্য খাবার। দেখতে সাগুদানার মতো গুড়ো গুড়ো। বিলেতি আর আমেরিকান বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন। কী আশ্চর্য ঘটনা! ওটা খাওয়ার পরদিনই ছোকড়া গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো। দুদিন না যেতেই তার উচ্চতা বেড়ে গেল কয়েক ইঞ্চি! গায়েও শক্তি আসলো। এমনকি ক্লাসে সে একদিনের মধ্যেই সবাইকে পড়াশোনায় ছাড়িয়ে গেল। একটা গুড়ো খাবারের তিন অত্যাশ্চর্য গুণ!

এমনি করে মঙ্গলাচার্যের ঝোলা থেকে একটার পর একটা জিনিস বের হচ্ছে। আর পাড়া মহল্লায় লেগে যাচ্ছে হই চই। পাশের গ্রামের অত্যাচারী চেয়ারম্যান এসেছিলেন বিষয়টা বুঝে দেখতে। মঙ্গলাচার্য তাকে পচা আম আর মিষ্টি কুমড়া দিয়ে বানানো একটা বিশেষ তরল খেতে দিলেন। ওমা! ওই চেয়ারম্যানের মস্তিষ্কে সেকি প্রক্ষালন! তিনি আর মিথ্যেই বলতে পারলেন না। হড়বড় করে বলে দিলেন কবে কার কোন সম্পদ কুক্ষিগত করেছিলেন। কোনওমতে জান বাঁচিয়ে

সেই চেয়ারম্যান এখন গাঁ ছাড়া। মুন্সিপাড়ার ডা. ঘোষাল এসে হাজির। মঙ্গলাচার্য তাকে উপহার দিলেন একটা জাদুকরী আতশ কাচ। ওই আতশ কাচ হাতের ওপর রাখলেই জীবাণু দেখা যায়! ডা. এখন আতশ কাচ দেখেই বলে কার ডায়রিনা হবে কার কলেরা হবে।

আর জীবাণুর ভয় দেখিয়ে তার সাবানের বিক্রিও রমরমা। রহিমের মা পেল এক মায়াবি ঘন তরল। যার এক ফোঁটা দিয়েই সারা মাসের ময়লা হাড়ি পাতিল সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

তনুদের পাড়ায় মশার উপদ্রব। তাদের জন্যেও মঙ্গলাচার্য একখানা জাদু পণ্য নিয়ে এসেছেন। একটা চক্রাকৃতির বস্তু। তাতে আগুন ধরিয়ে দিতেই বস্তু থেকে তীরসদৃশ কিছু ধোঁয়া নির্গত হতে থাকলো। তীররূপী ধোঁয়াগুলো সারা গ্রাম চষে বেড়ালো। মশার দেখা পেতেই সোজা বিধে যেতে লাগলো বুকে। মশারা ভয়েই গ্রামছাড়া।

দুদিন পর। পাশের বাড়ির মিনা এলো কাঁদতে কাঁদতে। মঙ্গলাচার্যকে বলল, মামা আপনি আমাকে কী এক তেল এনে দিলেন। ওটা চুলে লাগানোর পর আমার মিনসে আর কাজে যায় না। সারাদিন আমার চুলের ধারে বসে থাকে। এদিকে ঘরে নাই খাওন।

মঙ্গলাচার্য চিন্তিত মুখে বললেন, তোমার এই সমস্যার সমাধান তো আমার জানা নাই মা। তবে তুমি ফের তোমার গাছের নারকেল দিয়া বানানো তেলটাই মাখো। এতে যদি কাজ হয়।

হারু মাঝি বেশ গরিব। তার জামা কাপড় সবসময়ই নোংরাই

থাকে। এ জন্য গ্রামের সভা সমাবেশ ও যাত্রাপালায় তাকে কেউ ঢুকতে দেয় না।

মঙ্গলাচার্য বিলেত গিয়ে তার কথাও ভেবেছেন। নতুন আবিষ্কার হওয়া একটা গুড়ো করা সাবান দিলেন তিনি। হারু মাঝির পুরনো পাঞ্জাবিটা এক ধোয়াতেই নতুন হয়ে গেল। সবাই অবাক হয়ে ভাবে গরিব হারু মাঝি প্রতিদিন নতুন কাপড় পায় কই?

পকেটে টাকা থাকুক আর না থাকুক চকচকে পাঞ্জাবিটার জন্য হারু মাঝিকে সবাই দাওয়াত দিয়ে খাওয়ায়, আপ্যায়নও করে যখন তখন।

ঝোলার সব কিছু নিঃশ্বেষ প্রায়। এর মধ্যে একটা শিশি বোতল দেখা যাচ্ছে। ওটা মঙ্গলাচার্য নিজের জন্য এনেছেন। আতর গোত্রীয় সুগন্ধী। বাইরে বের হয়ে লম্বা শ্বাস নিয়ে বোতল হতে একটুখানি মাখলেন জামায়। আহা, ওই যে শ্রীমতি সুচিত্রা ছুটে আসছে! যার মন জয় করতে ব্যর্থ হয়ে মঙ্গলাচার্য বিলেত চলে গিয়েছিল। সুচিত্রা এখন তার দিকেই ছুটে আসছে! জাত পাত পরিবার সব বাঁধন ছিঁড়ে আসছে! আহা, সুগন্ধীর গুণ! কিন্তু সুচিত্রার পেছনে ওটা রমা খালা না? উনাকে কে আসতে বলেছে! একী! মনিরদের বাড়ির ঝিও দেখি আসছে! মঙ্গলাচার্যের কাছে ঘটনাটা অস্বাভাবিক ঠেকলো।

একটু পর কানে এলো শোর গোল। পুরো গ্রামের তরুণী নববিবাহিতা বিধবা বৃদ্ধা সবাই মঙ্গলাচার্যের দিকে ছুটে আসছে। মঙ্গলাচার্য দ্বিগবিদিক জ্ঞানশূন্যের মতো দৌড়াতে লাগলো। কিন্তু হাঁপিয়ে উঠছে সে। এই বয়সে আর কত

দৌড়াবে। এমন সময় পকেটে হাত দিতেই খুশির ঝিলিক। সদ্য আবিষ্কৃত একটা শক্তি পানীয় ওটা। দুই ঢোক গিলতেই অসূরের শক্তি ভর করলো মঙ্গলাচার্জের শরীরে। ধাঁই ধাঁই করে সে কী দৌড়! এক দৌড়ে মঙ্গলাচার্য বিলেতেই চলে গেল!”

জলে ঢাকা ঢাকা

হুড়মুড়িয়ে পড়তে শুরু করলো মতিঝিলের ঐতিহ্যবাহী শতবর্ষী পুরনো ফ্লাইওভার। নগরীর কেন্দ্রে মাটি ছোঁয়া আর বড় কোনও সেতু টিকে থাকলো না। ভাঙার পর বড় ঢেউটা আছড়ে পড়ার আগেই গুটিকয়েক দড়ি টানাটানি করে হিরোর মতো পালতোলা নৌকাটাকে ব্রিজের তলা দিয়ে বের করে নিয়ে আসলো মতিন। অতি আনন্দে হু হু টাইপের চিৎকার করেই বুঝতে পারলো ভুল হয়ে গেছে। চিৎকার শুনে ফেলল জল-ট্রাফিক। হাত ইশারায় ডাক দিয়ে দেখতে চাইল লাইসেন্স। পালতোলা নৌকার চেসিস নম্বর নেই। তা না হলে নৌকাটা চোরাই কিনা সেটাও চেক করতো। মতিন বিরস মুখ করে পকেটে হাত দিয়ে দেখলো এক লাখ টাকার নোটটা গায়েব। একটু আগে দড়ি ধরে ঝোলাঝুলি করার সময় পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল মনে হয়। অবশ্য ইদানীং ঢাকায় টাকার দাম নেই বললেই চলে। টাকা মানেই এক টুকরো কাগজ। তারপরও জল-ট্রাফিকেও ওটাই চাই।

‘স্যার, টেকা তো নাই। লন আপনারে এট্টু নৌকায় চড়াই।’

স্যার সম্বোধন শুনে পুলিশের মুখে ডিএমআরপির (ঢাকা মেট্রোপলিটন রোবট পুলিশ) মতো অটোমেটিক হাসি ফুটে উঠলো।

‘আচ্ছা যাও যাও। পালের নৌকার আবার লাইসেন্স কীসের। চুরি কইরা আবার ব্যাটারিতে চালাও না তো।’

‘কী কন স্যার, আমি তো এমপি মন্ত্রী না। আমার বাড়িঘর

নাই।’

‘ওই খালি যাইবা?’

ডাক শুনেই মতিনের নায়োকচিত ভাব উবে গেল। খানিকটা মেজাজও গরম হলো। কারণ ডিঙ্গি নৌকাকে খালি বলে ডাকার রেওয়াজ ছিল। তারটা চওড়া পালের নৌকা। চাইলে প্রপেলার লাগানো যাবে। স্ট্যাটাস আলাদা।

‘কই যাইবেন আফা?’

‘কাঁঠালবাগান।’

‘ভাড়া পৌনে দুই লাখ পড়বো।’

‘এত কেন! এটা তো ধানমণ্ডির ভাড়া চাইলেন!’

‘কাঁঠালবাগানে চোরা স্রোত আছে আফা। ঘূর্ণিও আছে এখন। লাইফ রিস্ক নিয়া যাইতে হইবো।’

অবশেষে দেড় লাখে ভাড়া রফা হলো। মতিন মনে মনে খুশি। যাত্রী অত্যাধিক রূপবতী।

মতিন তার নৌকা চালু করলো। চলছে হাওয়ার বেগে। যেন জেট চালাচ্ছে। পল্টনের কাছে আসতেই মতিন খুশিতে বাকবাকুম। রাস্তায় বিশাল জ্যাম। মিনি লাইটার জাহাজগুলো যে যেভাবে পারছে যাত্রী তুলছে। বিআরটিসির দুয়েকটা ফেরিও রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। মতিন গল্প জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করলো।

‘আমি আপা আর বেশিদিন এই নৌকা টৌকা চালামু না। টেকা জমলে বান্দরবানে জায়গা কিনবো ঠিক করছি। নীলগিরিতে নাকি এখন সাড়ে আড়াই বিলিয়নে কাঠা চলতেসে। আপনে কী কন।’

মতিনের কথায় কান দিল না তরুণী। মনে মনে ভাবছে ব্যাটা

বামুন হয়ে টাইটানে (শনির চাঁদ) হাত বাড়াতে চায়!
এক ঘণ্টাতেও জ্যাম না ছাড়ায় মতিন নিজেই মহাবিরক্ত। নৌকা থেকে নেমে খানিকটা সাঁতরে গিয়ে সামনের এক বজরার ড্রাইভারের কাছে জানতে চাইল, 'ওস্তাদ, জ্যাম ছাড়বে কুনসমে?'
'সামনে একটা ফেরির তলা রাস্তায় ঠেকছে নাকি।'
'ধুর! সিটি করপোরেশন করেডা কী! রাস্তাগুলা আরেকটু খুড়লেই তো হইতো। ড্রেজিং মেশিন মাইরা দিলে তো ফুরফুরাইয়া চলতো সব। দরকার হইলে পাইপ দিয়া বুড়িগঙ্গাথন আরও পানি আনি ঢালতো।'
নিজের নৌকায় ফিরে এলো মতিন। নৌকায় উঠতে যাবে এমন সময় দেখলো পাশে কোত্থেকে একটা মিনি ওয়াটারবাইক ভট ভট করতে করতে হাজির। তার নৌকার তরুণী যাত্রীকে দেখেই একগাল হেসে বলল, হাই জোলি, লিফট লাগবে নাকি?'
তরুণী যাত্রী সুড়সুড় করে নেমে গিয়ে ওয়াটারবাইকের পেছনের সিটে গিয়ে বসে পড়লো। মতিন চেয়ে চেয়ে দেখে, জ্যামের ফাঁকফোঁকর গলে কী সুন্দর চলে যায় বাইক। মতিনের মেজাজ গেল গরম হয়ে। 'পালতোলা নৌকার খেতা পুড়ি। আইজকাই বেইচা দিমু। দরকার হইলে আইজকাই লোন নিয়া সিএনজিচালিত স্পিডবোট কিনা ফালামু।
রাগে গজগজই সারা। সন্ধ্যার পর পর মতিন কাঁঠালবাগান এলাকায় এলো। মনে ক্ষীণ আশা, সেই তরুণীর দেখা পাবে। ঢালের দিকটায় ভয়ানক স্রোত। গলিতে ঢুকতেই হুড়মুড়িয়ে পড়লো যেন নৌকাটা। অল্পের জন্য উল্টে যায়নি। শোঁ শোঁ

করে কাঁঠালবাগান চ্যানেলের স্রোতের টানে এগিয়ে চলছে মতিনের জাহাজ, অন্তত এমন স্রোতে তার কাছে নৌকাটাকে জাহাজের মতোই মনে হয়। সামনে কী যেন ভাসছে দেখে পালের দড়িতে টান দিল। দুটো হাত! নেড়েচেড়ে সাহায্য চাইছে। স্রোতের চোটে লাইফজ্যাকেটেও কুলোতে পারছে না। মতিন তার রিজার্ভে রাখা বৈঠাটা বাড়িয়ে ধরলো। হাতের মধ্যে বৈঠার ছোঁয়া পেতেই আঁকড়ে ধরলো হাত দুটো। হাঁচড়ে পাচড়ে নৌকায় উঠতেই মতিনের চোখ কপালে।

'আরে আফা আপনে!'

'আর বইলেন না ভাই, স্রোতের যে টান। পলকা ওয়াটারবাইকটা সামলাতে পারেনি। আপনি আমায় বাঁচালেন।'

মতিন সহসা তার খুশিটা প্রকাশ করলো না। তরুণী বেঁচে আছে, কিন্তু চালক সেই তরুণটা কোথায়, এই প্রশ্ন করতে গিয়েও করলো না।

'তা তোমার নৌকাতো বেশ।'

এক মুহূর্তে আপনি থেকে তুমিতে! মতিন নড়েচড়ে বসলো।

'আপনি নামবেন কই?'

'আমার বাড়ি বাজারের শেষ প্রান্তে। ওই যে ড্রামওয়ালা বাড়িটার পর, রাবারের টিউবওয়ালা বাড়িটা। হায় হায়! বাড়িটা দেখি আরও তিন মিটার ভেসে গেছে!'

'ওদিকে নাকি হাঙর পাওয়া গেছে, কথা কি সইত্য?' মতিনের কথা শুনে পানসে হয়ে গেল তরুণীর মুখ।

'বাড়ি যাব। তবে তার আগে ধানমণ্ডি লেক থেকে একটু ঘুরে

আসলে মন্দ হয় না। কী বলো?’

গল্পে রাত হয়ে গেল। আকাশে বিশাল এক চাঁদও উঠলো। চাঁদ উঠলেই জলে ঢাকা ঢাকায় এক অদ্ভুত আলো-আঁধারি তৈরি হয়। নিচে চাঁদ উপরে চাঁদ। এমন পরিবেশে মতিন নিজেকে দস্যুজাহাজের ক্যাপ্টেন না ভেবে পারে না। মনে মনে ঠিক করলো এই মেয়ে যদি তাকে বিয়ে করতে রাজি হয় তবে নৌকার পাটাতনের তলায় যত্ন করে রাখা বাইশ ক্যারেটের এক বস্তা মাটি তাকে উপহার দিয়ে দেবে চোখ বুঁজে। এরপর দুজনে মিলে রাজধানী ছেড়ে চলে যাবে বহুদূর। কারণ শহরটা এবারও বাসের অযোগ্য শহর নির্বাচিত হয়েছে। যত্রতত্র রাস্তা খোঁড়াখুড়ি না করার কারণে যখন তখন নৌকার তলানি আটকে যায়। কয়েকটা ড্রেনের মুখ খুলে পানি চলে যাচ্ছে পাতালে, দেখা দিচ্ছে বিপদজনক ঘূর্ণি আর স্রোত। ফুটপাত নামে কিছু রুট থাকার কারণে সেখানে মানুষকে বাধ্য করা হচ্ছে সাঁতার কাটতে। তাতে নৌকা বা ওয়াটারবাইক উঠালেই জরিমানা!

মতিনের গলায় আচমকা স্বপ্ন ভর করে। ঢিমেতালে বলতে শুরু করে ‘ভাবতেসি এইবার ফাইনাল টিপ দিমু। সোজা বান্দরবানে। সেখানে সিনেপ্লেক্সে মুভি দেখবো। চিড়িয়াখানায় জন্তু জানোয়ার দেখবো, মাটির ওপর বানানো অ্যাপার্টমেন্ট দেখবো, চাকায় চলা বাস ট্রাকও আছে নাকি। সবচেয়ে বড় কথা সেখানে বড় বড় শপিং মল আছে। সবকিছু পাওয়া যাবে।

বড় বড় চোখ করে তরুণী বলল, ‘আমারে লগে নিবা মাঝি?’

মহাবিশ্বকাপে মহাত্রাস

বিজ্ঞানী মফিজউদ্দিন খুব একটা খেলা দেখেন না। তবে আজকেরটা দেখবেন। মহাবিশ্বকাপ-৪০৪২ এ পৃথিবীর সঙ্গে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলছে ইন্ডিনাটিস। পৃথিবীর একাদশে বাংলাদেশেরই আছে পাঁচ জন। এ জন্য সকাল থেকেই বসে আছেন টিভির সামনে।

ইন্টারগ্যালাক্টিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)-এর নিজস্ব চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে খেলা। প্রতিপক্ষ হিসেবে ইন্ডিনাটিস গ্রহ খুব একটা সুবিধার নয়। মাঠে ওদের কথাবার্তার কোনও ছিরি নেই। কারণ আছে অবশ্য। ওই গ্রহের বাসিন্দাদের লজ্জা শরম বলতে কিছু নাই। লজ্জা সংক্রান্ত বা এর আশপাশ দিয়ে যায় এমন কোনও অনুভূতি এখনও বিবর্তন প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়নি ওই গ্রহে। শুধু আন্তঃগ্যালাক্সি ব্যবসা বাণিজ্য করে কাড়ি কাড়ি টাকা কামিয়ে ফেলেছে, এই যা।

খেলা শুরু। বল করছে বাংলাদেশের এক বোলার। প্রথম বলেই পরিষ্কার বোল্ড! আউট! বলে চিৎকারও দিলেন মফিজউদ্দিন। কিন্তু একি! আম্পায়ার বলছে নো বল! সাড়ে নয় মাত্রার বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন আম্পায়ার আই-৪২০ সিরিজের রোবটটা উসখুস করছে। বোলারের পা লাইনেই ছিল। স্ট্যাম্পও পড়ে গেছে। তারপরও নো বল! ক্ষেপে গিয়ে পৃথিবীর ক্যাপ্টেন কারণ জানতে চাইলে আম্পায়ার রোবট

যান্ত্রিক গলাটাকে চিকন সুর বানিয়ে মিন মিন করে বললো, 'বলটা কোমরের উপরেই ছিল। নেমে যাওয়ার কারণ হলো গ্র্যাভিটি, মানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। এই বল করার সময় আমার সেন্সরে অস্বাভাবিক গ্র্যাভিটি ধরা পড়েছে। আর যেহেতু ওটার টানেই বলটা নেমেছে, তাই..।'

'কিসুই বুঝলাম না!' বিড় বিড় করলেন মফিজউদ্দিন। কিছুক্ষণ বাক-বিতন্ডা শেষে আবার শুরু। খানিক পর এলবিডাব্লিউর আবেদন। বল স্টাম্প বরাবর থাকলেও আউট দিল না আই-৪২০। থার্ড আম্পায়ারকে সিগনাল দিল। থার্ড আম্পায়ার কিছুক্ষণ ভিডিও ঘাঁটাঘাঁটি করে তথ্য পাঠিয়ে দিল চতুর্থ আম্পায়ারের কেন্দ্রীয় মডিউলে। বলের গতিপথ বিশ্লেষণ করছে ফোর্থ আম্পায়ার আইআই-৬৯ সিরিজের সুপারকম্পিউটার। আই-৪২০'র মতো এটাও তৈরি করেছে ইন্ডিনাটিস গ্রহের বিজ্ঞানীরা। বলের গতিপথের সঙ্গে মাঠের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের গতিও টেনে আনলো আইআই-৬৯। স্ক্রিনে অনেকগুলো রেখা। মহাজাগতিক নিউট্রিনো কণা কোনওভাবে বলের গতিপথ স্টাম্পের দিকে ঠেলে দিয়েছে কিনা সেটাও চেক করা হলো। মাপা হলো দুই কোটি আলোকবর্ষ দূরে থাকা একটা ব্ল্যাকহোলের আকর্ষণ বল। ব্ল্যাকহোলের টানে যদি বল স্টাম্পের দিকে যায়, তাহলে হয়তো আউট দেবে না।

এবার বাংলাদেশিদের ব্যাট করার পালা। ভালই খেলছিল। আচমকা একটা বলে আউট বলে চেঁচিয়ে উঠলো আম্পায়ার আই-৪২০। কী হলো! কী হলো! বল তো ব্যাটে লেগে মাঠেই গড়িয়ে যাচ্ছে। বোল্ড হয়নি, ক্যাচ হয়নি, রান আউটও

না। তবে! শোনা যাক আম্পায়ারের ব্যাখ্যা, 'ইন্ডিনাটিস গ্রহের বোলার যে গতিতে বল করেছে, তাতে থিউরি অব রিলেটিভিটি অনুযায়ী বলের জন্য সময়ের গতি কমে গিয়েছিল, অপরদিকে ব্যাটসম্যানের ঘড়িতে সময় এগিয়েছে দ্রুত। এই সূত্রে ব্যাটসম্যান বলটাকে যে গতিতে ছুটে আসতে দেখছে, তা বলের নিজস্ব সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। তাই বলের নিজস্ব সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে দেখা গেল ব্যাটসম্যান ব্যাট আগেই ঘুরিয়ে ফেলেছে। আর বল যেহেতু স্টাম্প বরাবর ছিল, তাই এটা বোল্ড আউট।'

মফিজউদ্দিনের কাতুকুতু নেই। তারপরও মনে হলো শরীরের আনাচে কানাচে কে যেন সুড়সুড়ি দিচ্ছে। গা দুলিয়ে হাসছেন, বিরক্ত হচ্ছেন, দম আটকে আসছে, মেজাজ চড়ছে; সব একসঙ্গে! আম্পায়ারের মতো তিনিও জটিল প্যারাডক্সে পড়ে গেছেন।

পরের বল। সজোরে হাঁকালো এক দেশি ব্যাটসম্যান। ছুটে গিয়ে সীমানার বাইরে আছড়ে পড়লো ইন্ডিনাটিসের এক ফিল্ডার। ক্যাচও ধরলো বাইরে থেকে। আম্পায়ার কিছু বলার আগে সে নিজেই আঙুল উঁচিয়ে বলল আউট। তাই বলে আই-৪২০ ও আউট দিয়ে দেবে! ঘটনা কী! ব্যাখ্যা তৈরি, 'দেখুন গতির ফলে দৈর্ঘ্য সংকোচন ঘটে। এটা বিজ্ঞানের বিষয়। আপনারা বুঝবেন না। রিলেটিভিটি বলে একটা বিষয় আছে। ফিল্ডার যে গতিতে ছুটে গেছে তাতে তার কাছে মনে হয়েছে বাউন্ডারিটা কাছে চলে এসেছে। আসলে তো আসেনি। এখানেই ঝামেলাটা বেঁধেছে। ফিল্ডার চলে গেছে পঞ্চমাত্রায়, আর বাউন্ডারি ত্রিমাত্রিক জগতে.. সুতরাং..।'

পৃথিবীর জেতার চান্স নেই। তারপরও শেষের দিকে আরেকটা ব্যাটসম্যানকে আউট দিয়ে দিল। এবার আর ব্যাখ্যা শোনার ইচ্ছে হলো না মফিজউদ্দিনের। ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়ালেন। একটা কিছু করা দরকার। দুই মিনিট পায়চারি করতেই থমকে দাঁড়ালেন। ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটলো।

আইসিসির কেন্দ্রীয় মডিউল হ্যাক করতে চল্লিশ সেকেন্ড লাগলো। যা সন্দেহ করেছিলেন তাই। আম্পায়ার রোবটদের সঙ্গে আইসিসির পালসার মডিউলের কানেকশন রয়েছে। বিভিন্ন শক্তি ও দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ পাঠিয়ে রোবটগুলোর কোয়ান্টাম ন্যানোচিপগুলোকে বিভ্রান্ত করে দেওয়া কঠিন কিছু নয়। ইন্ডিনাটিস গ্রহের তৈরি ন্যানোচিপগুলোতেও একটা রহস্যময় কোডিং দেখতে পেলেন মফিজউদ্দিন। তারমানে জন্ম থেকেই রোবটগুলো পক্ষপাত দোষে আক্রান্ত!

একে একে সব কোড মুছে দিলেন বিজ্ঞানী। ড্রয়ার থেকে বের করে আনলে পুরনো আমলের একটা পেনড্রাইভ। মফিজউদ্দিনের দাদা এই সফটওয়্যার বানিয়েছিলেন। দু-চারটা বাটন চাপতেই সফটওয়্যারটা আপলোড হয়ে গেল আইসিসির সবকটা রোবট আম্পায়ারের নিউরাল নেটওয়ার্কে। একযোগে ঝাঁকুনি খেলো রোবটগুলো।

মজা দেখার জন্য তৈরি মফিজউদ্দিন। ইন্ডিনাটিস বোলারকে থামিয়ে দিল দুই আম্পায়ার রোবট আই-৪২০। সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো তারা। 'এই ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করিলাম। আমরা এতক্ষণ যাবৎ যেই সকল সিদ্ধান্ত দিয়াছি, সকলই ভুয়া, সর্বৈব মিথ্যা। আমাদের সিস্টেমে ভাইরাস ঢুকিয়াছিল। ভাইসব আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।'

মফিজউদ্দিন শক্ত করে পেনড্রাইভটা চেপে ধরে আছেন। পেনড্রাইভে থাকা সফটওয়্যারটার নাম সততা ১.০। সততার কোনও সংস্করণ হয় না, তাই আর ওটা আপডেট করার দরকার হয়নি।

নিহিরুদের সময়

'বল কি দাদা! তোমার ব্রেইনবুক একাউন্ট নাই? তুমি তো বড্ড সেকেলে!'

নিহিরুর ৬৮ বছর বয়সী দাদা মসু সাহেব হেসে বললেন, 'দাদু ভাই, তোমাদের এইসব নতুন প্রযুক্তিতো আমি বুঝি না।'

'ওহ! দাদা! এ যুগে ব্রেইনবুক একাউন্ট ছাড়া কেউ কী করে থাকে, আমি ভেবে পাই না! গোটা দুনিয়া এখন বিবিতে চলছে।'

'বিবি?'

'আহ! ব্রেইনবুক মানে বিবি।'

মসু সাহেব অতীতে হারিয়ে গেলেন। দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর মুচকি হাসলেন। খাটের তলা থেকে পুরনো ট্রাংক বের করে ঝেড়ে মুছে নিলেন। বের করে আনলেন তার বাবার রেখে যাওয়া স্মৃতিচিহ্ন, ইন্টেল কোর আই হান্ড্রেড প্রসেসরের একটা ল্যাপটপ। অন করতেই ফুটে উঠলো সুপ্রাচীন ওয়েবসাইট। এখনও মনে আছে ইউজার আইডি আর পাসওয়ার্ড। খানিকটা শব্দ করেই বললেন, আহা! ফেসবুক! এখনও সেই আগের মতো!

মসু সাহেবের শৈশবের সঙ্গে এখনকার দিনের কোনও মিল নেই। আগে তিনি ছিলেন মতিন সুলতান। এখন শর্টকাটের যুগে হয়ে গেছেন মসু। এখনকার যন্ত্রপাতিও তার অচেনা। লোকে এখন ব্রেইনবুকে কথাবার্তা বলে। মাথার মধ্যে ক্যাপ

পরে কিভাবে যেন কথা হয়, দেখা হয়। হাতে মুখে কোনও কাজই করতে হয় না। সারাদিন মাথায় একটা ক্যাপ পরে বসে থাকো শুধু।

ল্যাপটপে টং করে শব্দ হলো। চমকে উঠলেন মসু। তার পুরনো বান্ধবী উহুরু তাকে ইনবক্স করেছে! এত দিন পর! মসু সাহেব কাঁপা কাঁপা হাতে উত্তর টাইপ করছেন। এখনও টাইপ করা ভুলে যাননি।

'ইয়ো মসু.. হাউ আর উ?'

'ফাইন উহুরু। হাউ আর ইউ ডুড।'

'সো সো। :-)। কী করছো এখন? ফেসবুকের কথা এখনও মনে আছে তোমার?'

'সব মনে আছে। এও মনে আছে যে তোমার পুরো নাম উম্মে হুমায়রা রুখসানা।'

'লোল! লোল! ইউ আর গ্রেট! চলো না কোথাও দেখা করি।'

মসু সাহেবের হঠাৎ মনে হলো ৬৮ এমন কোনও বয়স না। তা ছাড়া, ন্যানো পার্টিকেল দিয়ে চাইলেই বলিরেখা দূর করা সম্ভব। এই কদিন আগেই এক বুড়ো এমপি ঘটা করে বিয়ে করেছেন। দেখে মনেই হয় না বয়স তার একশ বিশ।

উহুরুর সঙ্গে কথা বেশিক্ষণ চালানো গেল না। নাতি এসে বায়না ধরেছে। ডিসেম্বর মাস। স্কুলে ভর্তির মৌসুম। ভর্তি গেইমে তার সঙ্গে দাদাকেও যেতে হবে। ভর্তির যুদ্ধ হবে সেকশন-২ এর স্টেডিয়ামে। গ্যালারিতে বসে থাকবেন অভিভাবকরা।

মসু গেলেন নিহিরুর সঙ্গে। এদিকে পথেঘাটে আবার বিরোধী দলের আন্দোলনের বাতাস। আজ থেকে একশ বছর আগে

ঐতিহাসিক একটি রাজনৈতিক দল আন্দোলনে নামার ঘোষণা দিয়েছিল। সেই থেকে এখনও প্রতিদিন আন্দোলন হয় হবে করছে। এখনও শুরু হয়নি। রাস্তায় মাঝে মধ্যে বিরোধী দলের ক্যাডার রোবটদের দেখা যায়। তবে ওরা জং ধরা। সার্কিটেও গন্ডগোল আছে। মাঝে মাঝেই উল্টাপাল্টা বক বক করে। আকাশের দিকে তাকিয়ে যান্ত্রিক গলায় চিৎকার করে বলে, 'ভাইসব! আমরা বলললতে ছা.. ই। এই দেশ আসলে এই পৃথিবীর না। এই দেশ অন্য আরেকটা গ্রহের দেশ। অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির গ্রহটাকে সরকার আমাদের দেশ বলে চালিয়ে দিচ্ছে। বিপ বিপ বিপ।'

নিহিরুর সঙ্গে ভর্তিযুদ্ধের ময়দানে হাজির মসু সাহেব। একটু পরই মাঠে স্পেশাল ইলেকট্রোড-পলিমার স্যুট পরে মাঠে নামবে কোমলমতি শিশুরা। প্রত্যেকের হাতে একটা করে সেন্সর-গান। একটু পর শুরু হবে ভার্চুয়াল যুদ্ধ। বড় বড় মনিটরে সেই যুদ্ধ দেখা যাবে। শিশুরা মাঠের মধ্যে যা করবে সেটাই দেখা যাবে বড় স্ক্রিনে। তবে স্ক্রিনের জগৎটা অন্যরকম। বুদ্ধি খাটিয়ে বিভিন্ন চড়াই উৎরাই পার হয়ে ওরা প্রতিযোগিতায় নামবে। একজনের সঙ্গে আরেকজনের যুদ্ধ হবে। আক্ষরিক অর্থে শিশুদের ভর্তিযুদ্ধ দেখে মসু সাহেব ঘামতে লাগলেন। শৈশবে এ ধরনের যুদ্ধ খেলা দেখতেন সিনেমায়।

যুদ্ধ শেষ। মানে ভর্তি পরীক্ষা শেষ। ভার্চুয়াল জগতে যারা সব লেভেল পার হতে পেরেছে তাদের মধ্যে নিহিরু নেই। তাকে আবার সাধারণ গেইম ওয়ার্ল্ড পর্ব শেষ করে পরে স্কুলের ভর্তির যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা খেলতে হবে।

মন খারাপ করে দাদার হাত ধরে জঙ্গলঘেঁষা রাস্তা ধরে হাঁটছে নিহিরু। এই একটা জিনিস মসু সাহেবের ভাল লাগে। শহরে এখন জঙ্গলের ছড়াছড়ি। মাঝে মাঝে কিছু জঙ্গি রোবট পথ আগলে দাঁড়ালেও মসু ও নিহিরুর পকেটে আছে ফ্রিকোয়েন্সি জ্যামার। জঙ্গি রোবটের সামনে সুইচ অন করলেই রোবটগুলো সোজা দাঁড়িয়ে দেশাত্মবোধক গান গাইতে শুরু করে। বিষয়টা মজাই লাগে মসু সাহেবের। তবে খুঁতখুঁতে ভাব রয়েই যায়। এখনও যারা দেশবিরোধী রোবট বানিয়ে জঙ্গিবাদ চর্চা করছে, তাদের জন্য একটা মগজ জ্যামার বানালে ভাল হতো।

অবাক চাঁদ দেখা

এইভাবে কখনো কিছু খুঁজতে হয়নি মহাবিজ্ঞানী ট্রিনিটি খন্দোকারকে। বয়স আশি ছুঁই ছুঁই। শ্বেতশুভ্র দাড়ি আর চুলের আড়ালে কুঁচকে আসা অনুসন্ধানী দুটো চোখে ক্লান্তির পাশাপাশি এখন স্পষ্ট বিরক্তি। চোখের তীক্ষ্মতা এতটুকু কমেনি। তাই বলে এই বয়সে এসেও খালি চোখে চাঁদ খুঁজতে হবে কেন? শত বলেও কাজ হয়নি। জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি বরাবরের মতো এবারও সম্মান দেখিয়ে দেশের সেরা মহাকাশবিজ্ঞানী মহান ট্রিনিটি খন্দোকারকে এ গুরুদায়িত্ব দিয়ে ফেলেছে। যিনি কিনা তার বেডরুমের টেলিস্কোপে অবলীলায় দেখতে পান অ্যান্ড্রোমিডার সবচেয়ে দূরের থ্রিও গ্রহযুগলকে।

'উফফ.. ঘাড় ধরি আইলোরে বাবা। চন্দ্রপুর-২৫৬ জেলায় তো আমার ভাইগনা নুরুদ্দি থাকে। ওর পুলাডা একটা চিক্কুর পারলে তো কইতে পারতাম চাঁন্দটা কুন কিনারে আছে।'

মহান ট্রিনিটি কথাগুলো কাউকে উদ্দেশ করে বলেননি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার আপনমনে বিড়বিড়ানিটাও বেড়ে গেছে। ঢাকার পরিত্যক্ত মতিঝিলের পাশের একটা খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে দিগন্তের ওপাশে চাঁদটাকে তন্নতন্ন করে খুঁজছেন বৃদ্ধ। ঘাড় না বাঁকিয়ে এক দলা থুথু ফেলতেই সিটি করপোরেশনের ক্লিনার-২৭ মডেলের লক্কড়ঝক্কর রোবটটা কিছু বললো না। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ঝিম মেরে বসে আছে। এমন সময় খোলা মাঠে ধুলো উড়িয়ে ছুটে এল ট্রিনিটির

মেজো ছেলের মেয়ে উহা। হাতে একটা সিনথেটিক ক্রলিকন-ফাইবারের জামা। এসেই ঝাঁপিয়ে পড়লো দাদাজানের কোলে।

‘গ্র্যান্ডপা দেখ, আমার ঈদের জামা! এইবার আমি ক্রিয়ানু গ্রহের ফ্যাশন ফলো করেছি! দারুন না!’

ট্রিনিটি খুব একটা খুশি হতে পারলেন না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার ভারি ভারি কথা বলার বাতিকও বেড়ে গেছে।

‘উহাপাখি শোনো, আমগো পৃথিবীর ফ্যাশনের একটা স্বকীয়তা আছে। আমরা কুন দুঃখে এলিয়েনের ফ্যাশন নিতে যামু, কও তো দাদুভাই। এইটা তো ঠিক না। পৃথিবীর বাজার এমনিতে ভিনগ্রহের ফ্যাশনে ভইরা গেছে।’

‘উফফ গ্র্যান্ডপা, তুমি একেবারে সম্রাট বারাক ওবামার যুগের মতো কথা বলছো।’

ট্রিনিটি দীর্ঘশ্বাস চেপে চাঁদ খুঁজতে লাগলেন। হাতে সময় নেই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে খুঁজে না পেলে কাল বাংলাদেশে ঈদ ঘোষণা হবে না।

বৃদ্ধ ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় সামনের আরামবাগ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো একটা গুগল। গুগল গ্রহের বাসিন্দা সে। কোনো এক কালে গুগল নামের একটা কোম্পানি গ্রহটাকে খুঁজে বের করেছিল। গুগলকে দেখেই সাবধান হয়ে গেলেন ট্রিনিটি। সারাক্ষণ ধান্ধা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় চার হাতের প্রাণীগুলো।

‘আরে মহান বিজ্ঞানী যে! আর বলবেন না, গত এক মাস ধরে নাসার লাইনে দাঁড়িয়ে আজকে টিকিট পেলাম। ঈদের সময় নাকি ওরা এক্সট্রা রকেট ছেড়েছে। সব ভাওতাবাজি।

এক মাস লাগে নাকি টিকিট পেতে। কী আজব গ্রহে এলুমরে বাবা।'

মনে মনে আবারো বললেন ট্রিনিটি, 'যেখান থেকে এসেছিস, সেখানেই ফিরে যা হতচ্ছাড়া'। ট্রিনিটির কাছে এখন চাঁদের পাশাপাশি বাকি সবকিছুকেই হতচ্ছাড়া মনে হচ্ছে।

এদিকে চাঁদ দেখা কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট বারবার কল দিয়ে যাচ্ছে তাকে।

'হ্যালো, টানাটুনি সাহেব? চাঁদ দেখা গেসেনি? দেইখলেও বলেন দেখেন নাই। কাইলকা ঈদ না হইলে আমার কুম্পানি আরো দুচাইরটা টিকিট বেশি বেচতে পারবো।'

'আমি ট্রিনিটি! মহান বিজ্ঞানী টুহান খন্দোকারের বংশধর। আমার সঙ্গে পলিটিশিয়ানদের মতো কথা বলবেন না!'

'বেশি ফাল পাইড়ো না বুড়া মিয়া। সিধা কুয়ালা গ্রহে ট্রান্সফার কইরা দিমু। ওইখানে বইসা তুমি পৃথিবীও খুঁইজা পাইবা না।'

ট্রিনিটি কথা না বাড়িয়ে লাইন কেটে দিলেন। বয়স শেষ প্রান্তে। যেখানে খুশি ট্রান্সফার করুক। কিছু এসে যায় না তার। ফের বিড়বিড় করলেন, 'গ্যালাক্সির সবকিছুতে পলিটিক্স ঢুইকা গেছে।'

পাশের রাস্তায় নড়বড়ে একটা স্ট্রিট ল্যাম্পের গোড়ায় কে যেন গলা খাকারি দিল।

'কে! কে ওখানে!'

'স্যার, আমি নিতাইবোট। পেন্টিয়াম সাড়ে চুয়ান্ন সিরিজের ডিসিসি রোবট।'

'ও, তা এ অবেলায় কী করতাসো। এহন তো সিটি

করপোরেশনের ডিউটি থাকনের কথা না।’

‘আমরা তো স্যার গরীব দুস্থ রোবট। আমগো কী আর ছুটি আছে। হাহ..। তা স্যার বেয়াদবি না নিলে একটা কথা..।’

‘বল বল, সংকোচ করো না। প্রাণ খুলে বলো। তুমি তো আর কর্পোরেট হাউসগুলোর উঁচু চেয়ারে বসা রোবট না। তুমি হইলা কামলা রোবট। হে হে।’

‘স্যার আসলে কথা হইল, অনেক্ষণ ধরে আপনারে দেখতাসি। আপনি আসলে ভুল জায়গায় চাঁদ খুঁজতাসেন। চাঁদ আপনার পেছন দিকে। আমি তো প্রতিদিনই দেখি।’

চমকে উঠলেন ট্রিনিটি খন্দোকার। বলে কি রোবটটা! প্রতিদিন সে চাঁদ দেখে। ‘আহা! কবিতার লাহান লাগলো কতাটা।’ বিস্ময় লুকানোর চেষ্টা না করেই পেছনের আকাশে চোখ পাতলেন ট্রিনিটি। আরে ঐ তো! কী সুন্দর বাঁকা চাঁদ! মিহি একটা রেখা। অথচ টেলিস্কোপে চোখ রাখলেই কী বিচ্ছিরি! জমি কেনাবেচার সাইনবোর্ড ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। এ মাথা ও মাথা বস্তি আর বস্তি উচ্ছেদ করার পরিত্যক্ত সব বুলডোজারে ভরা। ‘হায়রে চাঁদ! তরে আবার আকুল হইয়া খুঁজতেও হইতাসে!’

‘স্যার, ঘোষণা দিয়া দেন। চাঁদ দেখা গেসে এটাই আসল কতা। মজা হইল ঈদের দিন। বছরের এই একদিন রোবট আর মানুষে কোনো ভেদাভেদ থাহে না। যে বাড়িতেই যাই ফুল চার্জ কইরা দেয়।’

‘চিন্তা কইরো না নিতাই মিয়া, তোমারে আমি ফিশন ব্যাটারি দিব! কাজের কাজ করসো তুমি!’

পরিশিষ্ট : ইন্টারগ্যালাক্টিক ঈদ উৎসবে যোগ দিতে নানান

দেশ ও গ্রহের বিজ্ঞানীরা এসে হাজির। সকাল থেকে তারা অপেক্ষা করছে প্রধান অতিথি ট্রিনিটি খন্দোকারের জন্য। ট্রিনিটি সবসময়ই সবাইকে কিছু না কিছু খুঁজে বের করে চমকে দিয়েছেন। সবার ধারণা এবারের ঈদেও একটা কিছু করবেন তিনি। অবশেষে ট্রিনিটি এলেন। তাকে দেখামাত্রই হাইপারভোল্টেজের ধাক্কা খেল সবাই। সবার পরনে সর্বাধুনিক আল্ট্রা পলিথিলাইনিজিনের গ্লো শার্ট আর প্যান্ট। এ বছরের ইন্টারগ্যালাক্টিক পদকপ্রাপ্ত ফ্যাশন এটি। কিন্তু ট্রিনিটি পরে আছেন অদ্ভুত এক পোশাক। একেবারে মৌলিক ফাইবারে বানানো। অদ্ভুত ওই তন্তুটা দিয়ে পা দুটোকেও ঢেকেছেন গোল করে। এ যেন সাক্ষাৎ এলিয়েন! সবার দিকে হাত উঁচু করে ট্রিনিটি বললেন, 'ঈদ মোবারক বন্ধুগণ। তোমাগো কৌতুহল নিবারণের নিমিত্তে আগেই বলে রাখি, পৃথিবীর স্বকীয়তা বজায় রাখার জইন্যে আইজ আমি আমার পূর্বপুরুষের রাইখা যাওয়া অমূল্য এক পোশাক পরছি। গুগল আমারে কইসে, পোশাকটার নাম খদ্দরের পাঞ্জাবী আর কটন ফাইবারের লুঙ্গি। তবে উপরেরটা লুঙ্গি না নিচেরটা পাঞ্জাবী সেইটা ঠিক কইতে পারুম না।'

সুখি মানব

পঞ্চম প্রজন্মের রোবট ডেলিভারি বয়গুলোর মধ্যে খানিকটা আবেগ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, আমাকে চিঠিটা ধরিয়ে দেওয়ার সময় প-৫ রোবটের প্লাটিনাম আঙুলগুলো ঠক ঠক করে কাঁপছিল। একটা পিয়ন রোবট আমাকে দেখে ভয়ে কাঁপবে, ভাবতেই গা শিউরে উঠলো। তড়িঘড়ি চিঠিটা খুললাম। খোলার সময় মনে হচ্ছিল সরকারি কাজকর্ম ছাড়া তো এখন চিঠিপত্র আসে না। এটা কি তবে..। খুলতেই গায়ে দ্বিতীয়বার কাঁটা দিয়ে গেল। ভয়ের নয়, কাঁটাটা ছিল বেশ নরম, কোমল আর উত্তেজনায় ঠাসা। চিৎকার দিয়ে উঠলাম। গায়ে যত জোর ছিল। ঢাকা পূর্ব সিটি করপোরেশনের নতুন আইন অনুযায়ী যদিও আশি ডেসিবেলের বেশি জোরে চিৎকার দেওয়ার আইন নেই.. কিন্তু! আমার জন্য আবার আইন! আমি সুখি মানুষের লটারি জিতেছি যে! এখন আমিই রাজা!

উফফ.. আগামী এক মাস আমি এ শহরের সবচেয়ে সুখি মানুষ! আহা উহু! যা খুশি বলবো, যা খুশি করবো! কেউ কিচ্ছু বলবে না!

অতীতের পাঠকদের জন্য ব্যাপারটা খোলাসা করা যাক। এখন ৩০২৮ সাল চলছে। পৃথিবী ভালো নেই। চারদিকে অসুখি মানুষের ছড়াছড়ি। এর মধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখি মানুষের দেশ হয়ে গেল বাংলাদেশ। সেটা কিভাবে? সরকার একটা চমৎকার নিয়ম করেছে। প্রতি মাসে লটারিতে একজন

নাগরিকের নাম উঠবে। তার নামে চলে আসবে সরকারি চিঠি। ঠিক যেমনটা একটু আগে আমাকে দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে লেখা থাকবে, মাননীয় নাগরিক, আগামী এক মাসের জন্য আপনাকে এ নগরীর সবচেয়ে সুখি মানুষ ঘোষণা করা হলো। সুখি মানুষ অধ্যাদেশ আ.ল-২০ ধারায় বর্ণিত যাবতীয় নিয়মকানুন আপনার জন্য প্রযোজ্য।

আ.ল ধারা! আহা! যা খুশি করার স্বাধীনতার ধারা আজ আমার জন্য উন্মুক্ত! সকালের নাস্তা নিয়ে টেনশন করতে হলো না। পাড়ার দোকানে ফোন করতেই হুজুর হুজুর করে দিয়ে গেল ডিম পরোটা। ডিমটা কড়া ভাজা না হওয়ার জন্য আমি চাইলেই এখন দোকানদার মফিজিকে এলোপাতাড়ি চাবকাতে পারি। চাইলেই সবচেয়ে দামি রেস্তোরাঁয় গিয়ে বলতে পারি, সবাই বেরিয়ে যাও! আজ এই রেস্তরাঁ আমার! আমি একাই খাবো! ওরা আমার হুকুম মানতে বাধ্য। যদিও এক দিন আগে আমি ছিলাম বীমা কোম্পানির দালাল। আজ চাইলে আমি সবাইকে ধরে ধরে আমার ক্লায়েন্ট হতে বাধ্য করতে পারি। ধুর ছাই! কী ছাইপাশ ভাবছি!

রাতের পোশাকেই বেরিয়ে গেলাম। আশপাশে কাপড়ের দোকান তো আছে। আইডি কার্ডটা দেখালেই স্যার স্যার করে পোশাক এনে দেবে। আগামী এক মাস আমিই যে রাজা!

বন্ধুদের কেউ অভিবাদন জানালো। কেউ আমার সঙ্গে হাত কচলানোর উপলক্ষ খুঁজলো, কেউ বা সটকে পড়লো। ওরা হয়তো আমার সুখি হওয়াটা পছন্দ করছে না। আমার কী যায় আসে তাতে!

মতিঝিল যাব। রাস্তায় যানজট। তাতে কী! আইডিটা দেখাতেই তাৎক্ষণিকভাবে বাঁশি বাজিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে দিল ট্রাফিক রোবটেরা। সমস্ত সড়ক বন্ধ করে দিতে বললাম। তাই হলো। লাগুক মরণজট। আজ আমি একাই চলবো রাস্তায়। কেউ যদি ভুল করে রাস্তা পার হয় আর তাকে ধরে যদি আমি প্রকাশ্যে জুতোপেটা করি, তাতেও কিছু হবে না আমার। এই এক মাস আমি যাবতীয় আইনের ঊর্ধ্বে! কেউ আমার বিরুদ্ধে কিছু বলবে না।

এবার ভাঙা যাক দুচারটে আইন! বাহ কবিতা হয়ে গেল যে! ওই যে এক বড় ব্যবসায়ী দাঁত কেলিয়ে হোভার ক্রাফটে করে তার অফিসে যাচ্ছে। এমন ব্যবসায়ীদের পেছনে ঘুরে ঘুরে আমি কতই না হয়রান হয়েছি। লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আইডি দেখাতেই কথা বন্ধ হয়ে গেল। বললাম, বাছা, এবার নীল ডাউন হয়ে বসে থাক। একটু পর পর ব্যাঙের মতো লাফাবি। লোকটা তাই করলো! দৃশ্যটা দেখে হাসির রোল পড়ে গেল চারপাশে। আর রাজ্যের সুখ ভর করলো আমার মনে।

একটা বড় অফিসের সামনে দাঁড়ালাম। কতই না ইচ্ছে ছিল নিজের একটা বীমা কোম্পানি হবে একদিন। 'এই! ঘরটা এখুনি খালি কর! আজ থেকে এটা আমার কার্যালয়। আমি বসবো।' জো হুকুম জাহাপনা বলে নিমেষেই খালি! আমি রিভলবিং চেয়ারটায় আরামে বসে দোল খেলাম খানিক্ষণ। আমার আবার কাজ করতে হবে কেন! আমি তো সুখি মানব!

পরদিন। ঘরে বসে থাকার মানে হয় না। আজও বের হলাম। রাস্তাঘাট সুনসান। সামনে জটলা দেখে দাঁড়ালাম। কী হচ্ছে!

উত্তর এলো, 'আজ্ঞে হুজুর, নির্বাচন হচ্ছে'। ও তাই! দেখি কারা দাঁড়িয়েছে! এই সবাই বাদ। আমার ছবি দিয়ে ব্যালট ছাপাও। দেখি দেখি, ব্যালটগুলো দাও! আমি ভোট দেব। তোমার ভোট আমি দেব, যত খুশি তত দেব! তোমরা জানো না! সুখি মানুষের লাইসেন্স আছে আমার! এই দেখ! মুহূর্তে ভিড় উধাও। শূন্য কেন্দ্রে ভোট দিয়ে আমি নির্বাচিত বিজয়ী বেশে ঘুরে বেড়ালাম কিছুক্ষণ। আর মনে মনে সরকারকে ধন্যবাদ জানালাম।

কিছু দিন পর। যথারীতি আমার সুখ অভিযান চলতে থাকলো। এর মাঝে যা যা ঘটালাম তা হলো- বিশেষ কোনও কারণ ছাড়াই জেলে গিয়ে অনেকগুলো অপরাধীকে ছেড়ে দিলাম। ওরা শিষ্যের মতো আমার পিছু নিল। আমাকে নেতা বানালো। আমার সুখ আরও বেড়ে গেল। সুখের নেশা চেপে বসেছে আমার। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ইচ্ছেমতো মেয়েদের উত্যক্ত করলাম। পুলিশ এগিয়ে এসেছিল বটে। কিন্তু ওই যে লাইসেন্স আছে! এক মাস আমার গায়ে হাত দেওয়া তো দূরে থাক, উল্টো আমার অবাধ্য হলেই কঠিন সাজা! পুলিশগুলোকে বললাম, ব্যাটা আমাকে হাতকড়া পরাবি! এদিয়ে আয়, আঙুলের মটকা ফুটিয়ে দে!

আইডিটা গলায় ঝুলিয়ে হেঁটে বেড়ালাম নগরীর চোরাগলিতে, অফিস আদালতে। ভালো কি মন্দ, বিবেচনার সময় নেই। আমি শুধু জানি আমার লাইসেন্সের মেয়াদ আর কিছু দিন বাকি। এর মধ্যেই যত সুখ সব পাওয়া চাই। একদিনের জন্য প্রধানমন্ত্রী হলে কেমন হয়! আইডি দেখিয়ে সোজা চলে গেলাম কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাগারে। কর্মকর্তাদের আদেশ দিলাম,

আমাকে প্রধানমন্ত্রী বানাও। মুহূর্তে কী যেন.. ধাঁই! ধপাস। চোখ পিটপিট করে তাকালাম। দুনিয়াটা দুলে উঠলো। বিড় বিড় করে দুবার বললাম, ভূমিকম্প! ভূমিকম্প! কানের কাছে যান্ত্রিক একটা কণ্ঠ বলল, ভূমিকম্প নারে হারামজাদা, তোর মাথায় বাড়ি দিয়া অজ্ঞান করা হইসে। কথাটা বলেই রোবটটা চলে গেল। নিজেকে আবিষ্কার করলাম একটা রাস্তার নর্দমার ওপর। আশপাশে মানুষগুলো হেঁটে যাচ্ছে। কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। গলা হাতড়ে দেখলাম আইডিটা নেই। চিৎকার করে বললাম, আমার আরও এক দিনের সুখ পাওনা আছে....!

তোমাদের জন্য রাজনীতি

নতুন বছর শুরু হলো মাত্র। ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে বের হলো খন্দোকার রিরিহা। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থার চাকরি পেতে না পেতেই বেতন ডাবল। নতুন স্কেলের বেতন পকেট পর্যন্ত না এলেও প্রেমিকার সঙ্গে ইটালিক্সান গ্রহের ফাস্টফুড খাবে বলে ঠিক করলো। ঘর থেকে বের হতেই দেখলো ঢাকা-২৪ পয়েন্টের মোড়ে কীসের যেন গণ্ডগোল। আগের দিনের হরতালে হোভার ক্রাফট পোড়ানো মামলায় বিরোধীদলীয় নেতাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। গায়ে মাখলো না রিরিহা। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থায় পৌঁছানোর জন্য বাস-ক্রাফট ধরতে হবে। কিন্তু রাস্তা একেবারে ফাঁকা। গাড়ি নেই, রোবট ঘোড়াগুলোও গায়েব। পকেটের হলোটিভি চালু করতেই থ্রিডি খবর ভেসে উঠলো সামনে। বিরোধীদলীয় নেতাকে তার কার্যালয়ে আটকে রাখা হয়েছে। ঘটনা কী! খবরে আমতা আমতা করে রিপোর্টার যা বলল তা শুনে মেজাজ বিগড়ে গেল। গতরাতে নিয়ন্ত্রণ সংস্থার প্রধান নাকি স্বপ্ন দেখেছেন বিরোধীরা বিশাল গণসমাবেশ করছে। অন্য সব স্বপ্নের মতো এই স্বপ্নও যদি ফলে যায়! মনের খুঁতখুতানি দূর করতে বিরোধীদলের প্রধানকে ঘর থেকে বের হতেই দেবেন না বলে ঠিক করেছেন। তার বাড়ির গেটের সামনে প্লাটিনামভর্তি বিশটা অটোমেটিক স্পেসশিপ পড়ে আছে। রাস্তা বন্ধ। বিরোধী নেতা বের হতে পারছেন না।

জোর করে মন থেকে এসব ঝেড়ে ফেলল রিরিহা। তার

যাবতীয় চিন্তা এখন মিনিরাকে ঘিরে। পকেট থেকে আইফোন ৫৫৪ বের করতেই কল চলে গেল সাবেক প্রেমিকা জিহিরার কাছে। ফোনের মাইন্ড সেন্সরে সমস্যা! এদিকে কল চলে যাওয়ায় মোবাইল কোম্পানির বাধ্যতামূলক অফার শুনতেই হলো রিরিহাকে- এখন থেকে বন্ধ সিম চালু করলেই ক্ষমতাসীন দলের সদস্যপদ ফ্রি! দেরি না করে এখুনি রিচার্জ করুন! আপনি মানুষ হয়ে থাকলে ১ চাপুন, রোবট হয়ে থাকলে ২ চাপুন, রাজনৈতিক ক্যাডার হয়ে থাকলে ৩..।

অবশেষে কথা হলো মিনিরার সাথে। ঝপ করে মিনিরার একটা হলোগ্রাফিক ছবি ফুটে উঠলো রিরিহার পাশে। মোবাইলের ৫৩ জি নেটওয়ার্ক চালু হয়েছে। মিনিরার ছবিটা তাই একেবারে ঝকঝকে।

'হ্যালো রিরিহা, কোথায় তুমি? কতক্ষণ বসে থাকবো!'

'আমি গাড়ি পাচ্ছি না। কক্ষপথে নাকি জ্যাম লেগে আছে।'

'তা তো লাগবেই। এখন নিবিড়ু গ্রহে বেড়ানোর সিজন তুমি জানো না!'

'চলো আমরা না হয় চাঁদেই যাই। আহা, আমার অবহেলায় পড়ে থাকা চাঁদ। আমাদের চাঁদ!'

'সরকারি চাকরি করে কবিতাও লেখা হচ্ছে নাকি। নিয়ন্ত্রণ সংস্থার হাতে নিয়ন্ত্রিত হওনি তাহলে।'

'তা অল্পবিস্তর হয়েছি সত্য। হে হে। ডাবল ইনক্রিমেন্ট পেয়েছি তো, তাই শত চেষ্টা করেও মেজাজ গরম করতে পারছি না।'

'বাহ, বিক্রিও হয়ে গেলে!'

এরপর আরও গুটুর গুটুর অনেক কথা হলো। আচমকা কেটে

গেল লাইন। মেজাজ বিগড়ে গেল রিরিহার। কল ড্রপের ভূত এখনও যায়নি। কিন্তু না! আসল ঘটনা বুঝতে পারলো খানিক পর। সামনে সটান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুই পুলিশ রোবট। ওরাই লাইন কেটে দিয়েছে। আয়রন ম্যানের মতো পোশাক পরা। আচমকা ঠং করে শব্দ হলো। দূর থেকে কেউ একজন ঢিল ছুড়েছে। কিন্তু ফাইবার স্টিলের পোশাক পরা পুলিশটা পাত্তাই দিল না। যান্ত্রিক গলায় বলল, 'আপনাকে আটক করা হলো মহামান্য রিরিহা। আপনি আমাদের সঙ্গে ধীরেসুস্থে থানায় চলুন।'

সরকারি চাকুরেদের মহামান্য বলার রেওয়াজ আছে রোবট পুলিশদের। কিন্তু আটক করবে কেন।

'আমার অপরাধ?'

'মহামান্য আপনি সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছেন। কাল বিরোধীদলের অবরোধ। তাই আমরা ৫৪ ধারায়..।'

'হয়েছে হয়েছে! আমি যাচ্ছি না তোমাদের সঙ্গে। আমার ডেট আছে। রাস্তা ছাড়ো।'

'তাইলে ব্যাটা তোরে চ্যাংদোলা কইরা লইয়া যামু! সকাল থিকা ডিউটি দিতেসি। প্রসেসর তামা তামা হইয়া গেছে। চল!'

থ হয়ে গেল রিরিহা। ভেবেছিল সরকারি কর্মকর্তা হওয়ায় পুলিশগুলো কিছুটা সম্মান দিচ্ছে। ওটা ছিল রোবটিক আনুষ্ঠানিকতা। বিনাবাক্যে রোবট পুলিশ দুটোর সঙ্গে গাড়িতে উঠলো রিরিহা। ভাল করেই বুঝতে পারছে আজ আর দিনের আলো দেখা হচ্ছে না তার। মাটির তলায় বানানো অতিকায় জেলখানায় রাত কাটাতেই হবে।

জেলে বসে মুহূর্তের মধ্যে ভাবুক হয়ে গেল রিরিহা। আসলেই, এতদিন শুধু চাকরিই করে গেছে। দেশ জাতি নিয়ে সেভাবে ভাবার সময় পায়নি। কিন্তু সামনের দৃশ্যটা দেখে ভাবনার সুতো কেটে যাচ্ছে বারবার। দুই রোবট কনস্টেবল বসে বসে বিচিত্র ভঙ্গিতে ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা চিবুচ্ছে। মাঝে একবার গুজব ছড়িয়েছিল এই গাছের পাতায় নাকি চার্জ আছে। কিন্তু বোকা রোবটগুলোকে কে বোঝাবে যে পাতা চিবুলে বিদ্যুত তৈরি হয় না। রিরিহার মনে হলো গোটা জাতিই এভাবে পাতা চিবুচ্ছে। কেউ কাঁঠাল পাতা, কেউ কলা পাতা, কেউ ইতিহাস বইয়ের পাতা, কেউ...।

'স্যার মিরিজা মিয়া তো আবার প্রেসক্লাবে গেছে। ওইখানে গিয়া একটু ডলা দিয়া আসবো নাকি। শুনলাম কাইল নাকি হরতাল দিব।'

কথাটা কানে আসতেই রিরিহার মন বিষিয়ে গেল। হরতাল মানে আগামী এক সপ্তাহ কোনও হোভার ক্রাফট চলবে না। বড় বড় স্পেসশিপগুলোও কোথাও যাবে না। বাংলাদেশের সঙ্গে অন্য দেশ তো দূরে থাক, অন্য গ্রহের যোগাযোগও বন্ধ হয়ে যাবে।

'হি হি হি। চিক্কা মিরা গিয়া উলুলুলু বাংলাদেশ।'

হাসির মতো শব্দটা এসেছে পাশের সেল থেকে। তাকিয়ে দেখে নিড়িক্কু গ্রহের এক লিকলিকে বাসিন্দা। তাকেও ৫৪ ধারায় আটক করা হয়েছে। নিজেদের ভাষায় বাংলাদেশ নিয়ে একটা কিছু বলেছে কিলবিলে প্রাণিটা। নিশ্চয়ই উপহাস করেছে। বন্দি না থাকলে ওর শুঁড় একটা ছিড়ে দিত রিরিহা।

'বুঝলে না ভায়া! বললাম, তোমরা হচ্ছো গোটা গ্যালাক্সির

সবচেয়ে বিচিত্র প্রাণি। নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করে জিততে চাও। এখন তো তোমরা ছুটি পেলে অন্য গ্রহে বেড়াতে যাও। কদিন পর অন্য গ্রহের প্রাণিরা বাংলাদেশে আসবে কেবল তোমাদের দেখতে।'

'হারামজাদা তোর নলি ছিড়ে হাতে ধরাই দিব। ওহ, তোর তো সবই নলি, হাতই তো নাই।'

চুপ মেরে গেল প্রাণিটা। ভেবেছিল রিরিহা তাকে সাপোর্ট করবে। কিন্তু উল্টো তাকেই যে এভাবে ধমক খেতে হবে ভাবেনি ও। মনে মনে ভাবলো আসলেই বিচিত্র প্রাণি এরা।

পাশের আরেকটা সেলে কান্নার শব্দ শুনে মেজাজ আরও বিগড়ে গেল রিরিহার। একটা পুরোদস্তুর তরুণ ফোনে তার বাবার সঙ্গে চীনা ভাষায় কথা বলছে। চাইনিজ মিডিয়ামে পড়া পুতুপুতু টাইপের ছেলে। রাজনীতি ফাজনীতি বুঝে না। বেকায়দায় ধরা পড়ে গেছে বোধহয়। 'এই চীনা ভাষাটা খেয়ে ফেলল প্রজন্মটাকে। বাংলা বুঝেই না।

'কি রে কবি! কার ঘরে চুরি করতে গিয়া ধরা খাইলি।'

'ওরে দোস্ত! তুই কী করে খবর পেলি!'

পুরনো বন্ধু সুমুনুকে দেখে খুশিতে ফেটে পড়লো রিরিহা। তার এক বন্ধু যে বড় নেতা তা তার খেয়ালেই ছিল না। মুহূর্তে বদলে গেল পরিস্থিতি। একটু আগে যে রোবটগুলো তাকে তোয়াক্কা করছিল না তারা এখন মহামান্য মহামান্য বলতে বলতে মুখে ধোঁয়া তুলে ফেলল। একজন তো শক সহ্য করতে না পেরে হ্যাং হয়ে গেল। আরেকজনের সিস্টেমে প্যাঁচ লেগে গেল, একটু পর পর স্যালুট দিচ্ছে আর বন বন করে ঘুরছে। অন্যরকম একটা পুলক অনুভব করলো রিরিহা।

ক্ষমতার পুলক। ভাবলো সারাজীবন সরকারি চাকরির জন্য পড়াশোনা করাটা চরম ভুল হয়েছে। রাজনীতি করলেই পারতো। আপাতত ঠিক করলো, কবিতা টবিতা বাদ দিয়ে এখন একটা উপন্যাস লিখবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। বইয়ের নাম হবে 'তোমাদের জন্য রাজনীতি'।

থানা থেকে বের হয়েই পকেট হাতড়াতে লাগলো রিরিহা। সুমুনু জানতে চাইল, কীরে কী খুঁজিস? উত্তেজিত রিরিহা কাঁপাকাঁপা কণ্ঠে বলল, 'বন্ধ সিম খুঁজি রে! বন্ধ সিম!'

পৃথিবীর কোড

আন্ত মহাকাশীয় সম্মেলনে সচরাচর পৃথিবীকে বিশেষ পাত্তা দেওয়া হয় না। ছোটখাটো গ্রহ, মানুষগুলোও অন্য গ্রহের প্রাণীদের চেয়ে একটু হ্যাংলা-পাতলা। তবে বুদ্ধিসুদ্ধির কারণে মাঝে মাঝে মানুষদের ডাকা হয়। আজকের সম্মেলনের কথা আলাদা। সম্মেলন ডাকাই হয়েছে পৃথিবী ঘিরে। নজিরবিহীন ঘটনা। আর পৃথিবীর একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন মহাকাশবিজ্ঞানী বজলু খন্দকার। একটু পর পর কৌটা থেকে পান বের করে খাচ্ছেন আর উপস্থিত বক্তাদের কথা এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দিচ্ছেন। তাঁর পান চিবানো দেখে একটু পর পর মহাবিরক্ত হয়ে জিব নাচাচ্ছে উলুলু গ্রহের লিকলিকে এক প্রতিনিধি। বিজ্ঞানী বজলু নির্বিকার। উলুলুর দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটলেন। প্রাণীটা খুশি হয়ে গেল। তাদের গ্রহে ভেংচি কেটেই সম্মান দেখানো হয়। পৃথিবীর প্রতিনিধি হিসেবে বিজ্ঞানী বজলুকে আলাদা গুরুত্ব দিয়ে ডাকা হলেও তিনি ভাবলেশহীন। তিনি অবশ্য এখনো বুঝে উঠতে পারছেন না ঘটনা আসলে কী।

পরিচয়পর্ব আর ছোটখাটো সমস্যার কথা বলল অনেকে। শেষের দিকে এসে আসল কথা বলতে শুরু করল স্যারকারান গ্রহের বিদঘুটে এলিয়েনটা। তার কথাবার্তা, আচার-আচরণ পুরোই স্বৈরাচারের মতো।

‘মাননীয় মহাকাশীয় প্রাণীবৃন্দ। আপনারা জানেন, আমরা

মানে স্যারকারানিয়ানরা এই মহাকাশে সবচেয়ে ক্ষমতাধর ও সম্পদে ভরপুর প্রাণী। আমাদের কাছে এই মহাবিশ্বের সর্বাধুনিক অস্ত্র থেকে শুরু করে সবই আছে, যা কারো কাছে নেই। আমরা চাইলেই যেকোনো গ্রহকে নিমেষে উড়িয়ে দিতে পারি। এ কারণে আপনাদের কেউ কেউ আমাদের গোলামি করেন, কেউ কেউ আমাদের উপহার দেন। আমরা সময়ে সময়ে আপনাদের নিরাপত্তাও দিই। কিন্তু আমাদের সুযোগ-সুবিধাও আপনাদের দেখতে হবে, নাকি? সম্প্রতি আমাদের বৃহস্পতি গ্রহের গ্যাসের দিকে নজর পড়েছে। ওটার গ্যাস আমাদের লাগবে। এদিকে আমাদের মধ্যে যাঁরা ধনী, তাঁদের মঙ্গল ও শুক্র গ্রহটা পছন্দ হয়েছে। তাঁরা এ দুটি গ্রহে রিসোর্ট বানাতে চান। রিসোর্ট বানাতে গ্যাস নিয়ে যেতে হবে সেখানে। তারপর আবার নিয়মিত যাতায়াতও করবেন তাঁরা। কিন্তু এই রুটের ঠিক মাঝে এসে পড়েছে পৃথিবী। গ্রহটা আমাদের মোটেও পছন্দ নয়। বাজে ধরনের সবুজ একটা প্রাণীতে ভরা এ গ্রহ। কথা নাই, বার্তা নাই সারা দিন দাঁড়িয়ে থাকে আর বিষাক্ত অক্সিজেন ছাড়ে ওটা। আপনারা জানেন, অক্সিজেন জিনিসটা কত খারাপ। আমাদের মতো কার্বন ডাই-অক্সাইড ভিত্তিক প্রাণের জন্য এটা মোটেও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। তা ছাড়া মঙ্গল থেকে শুক্রে যাওয়ার পথে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটাও বাগড়া বাধায়। আমাদের স্পেসশিপগুলোকে হিসাব-নিকাশ করে চলতে হয়। তো বুঝতেই পারছেন আমাদের সমস্যা হলো পৃথিবী। তাই আমরা ঠিক করেছি পৃথিবীটাকে সৌরজগৎ থেকে সরিয়ে দেব। মানুষগুলো এতে মরে যেতে পারে। তবে যারা

আমাদের গোলামি মেনে নেবে, তাদের আমরা ক্রাশিয়ামপুর গ্রহে পাঠিয়ে দেব। ওটা আকারে বড়সড়। বিচ্ছিরি সবুজ প্রাণীও আছে সেখানে। তাদের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বিষাক্ত অক্সিজেনও পাঠিয়ে দেব। এখন এ বিষয়ে আপনাদের ভোট দরকার। ভোট পেলে সুবিধা হয়। আর না পেলে আপনাদেরও ঘোর বিপদ। কী বলেন ভাইসব?'

বিজ্ঞানী বজলু ভেবেছিলেন ঘুম দেবেন। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ঘুমাতে পারছেন না। সবার দিকে তাকালেন। কেউ টুঁ শব্দ করছে না। পাগল নাকি! একটা গ্রহকে সরিয়ে দেবে ওরা আর কেউ প্রতিবাদ করছে না! বিজ্ঞানী বজলু উত্তেজনায় আরেকটি পান মুখে দিলেন। তাঁর মুখে এখন দুটি পান। তিনি হালকা করে কাশলেন। পানের পিক ফেলে বললেন, 'দেখো ভাই স্যাকারিন, আমরা শান্তিপ্রিয় প্রাণী। পৃথিবীর গাছ আর অক্সিজেন তোমাদের ভালো না লাগতে পারে, কিন্তু আমাদের বেশি ঘাঁটিও না।'

'ঠাঁ ঠাঁ ঠাঁ...হাসালে আমায় হে মানুষ। চাইলে তোমাকে এখুনি...।'

'চাইলে তুই আমার কিছুই করতে পারবি না রে হাঁদারাম!'

নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছে না বজলুর। পুরোপুরি অন্ধকারে ঢিল ছুড়লেন। প্রাণীটার ক্ষমতার কথা টুকটাক শুনেছিলেন। কিন্তু তাই বলে এভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভরা মজলিশে ক্ষমতাধর এলিয়েনকে খেপানো ঠিক হলো কি না...।

'হুঁঠুর পুঁচ মাচুন! (মানুষটা বলে কী!)'

'ব্যাটা বাংলায় বল! তুই ভেবেছিস তোদের গোপন খবর আমার জানা নেই। আমি বাংলার বিজ্ঞানী বজলু, পৃথিবীর

বিজ্ঞানী। গ্যালাক্সির কোনো এলিয়েন আমাদের সঙ্গে পাঙ্গা নিতে পারে নাই। আর তুই এসেছিস আমাদের গ্রহ নষ্ট করতে!'

বিজ্ঞানী বজলুর আচমকা এত সাহসের পেছনে কলকাঠি নাড়াচ্ছে রোবট মন্টু মিয়া। সে এতক্ষণ ধরে বিজ্ঞানীর কানে লাগানো হেডফোনে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছিল। স্যারকারান গ্রহের দুর্বলতা খুঁজছিল সে। পেয়েও গেছে মোক্ষম একটা। আর সেটাই সে বিজ্ঞানীকে জানিয়ে দিয়েছে।

বিশাল শরীর নিয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করল স্যারকারানিয়ানটা। অন্য এলিয়েনরা ভয়ে নড়াচড়া বন্ধ করে দিয়েছে। কেউ কেউ ভয়ে নিজেকে অদৃশ্যও করে ফেলেছে। বিজ্ঞানী বজলু অনড়। স্যারকারানিয়ানটাকে দেখে মনে হচ্ছে সে খানিকটা ঘাবড়েও গেছে। পৃথিবীর মানুষটা এত সাহস পেল কোথা থেকে বুঝে উঠতে পারছে না। এদিকে বিজ্ঞানীর কানে কানে বলে দিল রোবট মন্টুর্ 'স্যার, আমি রেডি। শয়তানডারে কন হাইপার-স্যাটেলাইট রেডি। এখন ট্রান্সমিশন দিয়া দিমু।'

মন্টুর কথা শুনে সাহস দ্বিগুণ বেড়ে গেল বিজ্ঞানীর।

'ওহে স্যাকারিনের বাচ্চা! তোর গ্রহের প্রাণীদের মধ্যে একটা জিনিস নাই। সেটার ট্যাবলেট আছে আমার কাছে। মানুষের নিউরনের সবচেয়ে বড় কোডিংটা ডিকোড করেছি আমি। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় অস্ত্র ওটা। সেটা এখন তোর গ্রহের প্রাণীগুলোর দিকে তাক করা। সুইচে চাপ দিলেই ওই কোডিং তোদের গ্রহের প্রাণীরা লুফে নেবে। আর এটা নেশার মতো। একবার ধরলে ছাড়াছাড়ি নাই। একজনের কাছ থেকে

আরেকজনের কাছে যাবে ওটা। খুব ছোঁয়াছে।’
দাঁড়িয়ে গেল স্যারকারানিয়ানটা। ‘কিসের কোডিংয়ের কথা বলছ হে নিকৃষ্ট মনুষ্য! ঠাঁ ঠাঁ ঠাঁ!’
বিচ্ছিরি হাসিটা শেষ হওয়ার আগেই পকেটে থাকা সুইচে চাপ দিলেন বজলু। ঘটনা কী ঘটল তা উপস্থিত কেউ টের পেল না। তবে থমকে দাঁড়াল স্যারকারানিয়ান। কেমন যেন মিইয়ে গেছে ও। সবাই হাঁ করে বিজ্ঞানীর দিকে তাকিয়ে আছে। স্যারকারানিয়ানটা হঠাৎ দৌড়ে এসে তিন-চারটি শুঁড় বাড়িয়ে বিজ্ঞানী বজলুকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল। বিকট সেই কান্না দেখে বিজ্ঞানী বজলু ঘাবড়ে গেলেন। কানের কাছে মন্টুর আশ্বাস ‘ডরাইয়েন না স্যার। তারেও ধরছে কোডিংটায়।’

বিজ্ঞানী বজলু এবার গলা খানিকটা খাদে নামিয়ে বললেন, ‘উপস্থিত সুধী। পৃথিবী ছোটখাটো গ্রহ সন্দেহ নাই। তবে আমার ক্ষুদ্র গবেষণায় যা দেখেছি, তা হলো একমাত্র পৃথিবী নামের গ্রহে একটা জিনিস আছে, যা আপনাদের মতো বড় বড় গ্রহের ক্ষমতাধর এলিয়েনদের মাঝে নেই। এটা একটা বিশেষ নিউরাল কোডিং, যার স্বাদ কোনো খাবার বা সম্পদে আপনারা পাইবেন না। আপনাদের নিউরাল নেটওয়ার্ক ওইভাবে তৈরিই হয় নাই। তবে হ্যাঁ, আমি মানুষের ওই কোডিংয়ের এমন এক ভার্সন তৈরি করেছি, যা আপনাদের মগজে বসাইয়া দেওয়া যাইবে। এই মাত্র যা স্যারকারানিয়ানদের মাথায় ঢোকানো হয়েছে। তারা এখন আর কারো ক্ষতি করবে না। উল্টো উপকার করে বেড়াবে।

এখন আপনারাও কি সেই কোডিংয়ের স্বাদ পাইতে চান?’ একযোগে উপস্থিত সব এলিয়েন সায় দিল। বিজ্ঞানী বজলু আরেকটি পান মুখে পুরে ওয়্যারলেস ফোনে রোবট মন্টুকে নির্দেশ দিলেন, ‘ও মন্টু, এইখানকার সব এলিয়েন ভাইয়ের মাথায় ভালোবাসার কোডটা ঢুকাইয়া দাও।’

ভার্চুয়ালে বিপদ

‘মহাবিজ্ঞানী ম, আপনি অতিদ্রুত কেন্দ্রীয় অফিসে চলে আসুন।’

বিরক্তিকর বার্তাটি শুনেই ঘুম ভাঙল মহাবিজ্ঞানী ম ওরফে মতিন সাহেবের। গলাটা স্বয়ং নিয়ন্ত্রণ সংস্থার প্রধানের। বেচারা নিশ্চয়ই আবার ফোনে মেসেজ পাঠানোর সিস্টেম ভুলে গেছেন। সামান্য কাজটার জন্যও গবেষণা সংস্থার প্রধান বিজ্ঞানীকে ডাকতে হয় তাঁর! হাই তুলতে তুলতে প্রধানকে বলতে শুরু করলেন মতিন, ‘মেসেজ পাঠানোর জন্য প্রথমে স্মার্টফোনটাকে আনলক করুন। আনলক করতে পাসওয়ার্ড হিসেবে এক ফোঁটা রক্ত সেন্সরে দিন। ডিএনএ অ্যানালাইসিস করে ফোন বুঝবে এটা আপনি। তারপর স্মার্টফোনটিকে মস্তিষ্ক প্রক্ষালকযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করুন। মনে মনে ভাবুন...।’

‘রাখো তোমার মেসেজ! মহাবিপদ হয়েছে! নতুন ভাইরাস ধরা পড়েছে। মেটালিক ভাইরাস! মানুষরা সব যন্ত্র হয়ে যাচ্ছে!’

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন বিজ্ঞানী মতিন। নিজের ডান হাতটা দেখলেন। আরে! কদিন ধরে শরীরটা কেমন ভার ভার লাগছিল। ডান হাতটা শক্ত শক্ত। হাতের সঙ্গে কিছু লাগলে ঠং জাতীয় শব্দও করে। আশঙ্কা তাহলে সত্যি। চিৎকার করলেন বিজ্ঞানী মতিন, ‘হায়! আমরা কি তবে যন্ত্র হয়ে যাব!’

ঝটপট পরে নিলেন অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি জুতা। পাখির পালকের মতো ডানাগুলো পরেই উড়াল দিলেন। এ জুতা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অকেজো করে দেয়। পরা মাত্রই ওজন পালকের মতো। আরেকটু হলেই ধাক্কা খেতেন এক উড়ন্ত লোকের সঙ্গে। লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরা লোকটার পায়েও অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি জুতা। পাশে তার বউও উড়ছে। মতিন সাহেবের পথ আটকেই গড়গড় করে বলল, 'স্যার, আমার বাড়ি মিররপুর গ্যালাক্সির পাইক্সপাড়া গ্রামে। ঢাকায় আসছিলাম কামের সন্ধানে। পকেটে স্পেসশিপের ভাড়া নাই। ২০০টা টেকা দিলে বাড়ি যাইবার পারি।' নতুন ধান্দাবাজির সঙ্গে ভালোই পরিচিত বিজ্ঞানী মতিন। পাত্তা না দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। সামনে ফ্লাইওভার দেখে নিয়মানুযায়ী তার ওপর দিয়ে ফ্লাই করলেন মতিন। সঙ্গে সঙ্গে হাত ইশারায় থামাল আকাশ ট্রাফিক। মতিন সাহেব সরকারি আইডি কার্ড দেখালেন। কাজ হলো না। 'হেলমেট না পইরা উইড়া আইন ভাঙছেন। ৫০০ টেকা জরিমানা।' জরিমানার জন্য নয়, আকাশ ট্রাফিক সার্জেন্টের রোবটের মতো কথা শুনে ঘাবড়ে গেছেন বিজ্ঞানী। ভাইরাসটা কি তবে মানুষের মনমানসিকতাকেও রোবটিক বানিয়ে দিচ্ছে!'

জরিমানা দিয়ে ছাড়া পেলেন মতিন। যেতে যেতে খোলা মাঠে চোখ পড়ল। নিচে নেমে এলেন কী মনে করে। একদল তরুণ-তরুণী ঘাড় গুঁজে বসে আছে। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না। এর মধ্যে দু-একজনের মাথায় আবার অ্যান্টেনার মতো কী যেন দুলছে। একজনের চোখে চোখ পড়তেই মতিন সাহেব আঁতকে উঠলেন। তরুণের চোখ দিয়ে উজ্জ্বল সবুজ

আলো ঠিকরে বের হচ্ছে। ছেলেটা দাঁত কেলিয়ে বলতে থাকল, 'আমি অনলাইনে, আমি অনলাইনে। অনেক মজা। আমি পুরোপুরি অনলাইনে। অনেক মজা...অনেক মজা...অনেক।'

মতিন সাহেব বুঝতে পারলেন বিষয়টা। ভাইরাসটা সম্ভবত এভাবেই ছড়িয়েছে। ফেসবুকের নতুন ফিচারটাই তবে এর জন্য দায়ী। ওটা দিয়ে আস্ত মানুষকে অনলাইনের ভার্চুয়াল জগতে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। মানুষের মগজটা তা হলে নিজেকে প্রসেসর ভাবতে শুরু করেছে। নিউরনগুলো হয়ে গেছে একেকটা ট্রানজিস্টর। সেখানেই তৈরি হয়েছে ডিজিটাল ভাইরাস। এরপর ভাইরাসটা শরীরের কোষে ভর করে কোষগুলোকে বানিয়ে ফেলতে শুরু করেছে ধাতব বস্তু। মতিন সাহেব গত সপ্তাহে একবার ফেসবুকে ঢুঁ মেরেছিলেন। ভাইরাসটা এ কারণে তাঁকেও ধরেছে। তবে কাবু করতে পারেনি। এদিকে আরেক তরুণী সামনে এসে দাঁড়ালো। চোখ থেকে লাল আলো বেরোচ্ছে। 'বিজ্ঞানী ম। আপনার সর্বশেষ চিন্তায় আমার লাইক গ্রহণ করুন।' এ কথা বলেই তরুণী তার ডান হাতের বুড়ো আঙুল কেটে বিজ্ঞানী মতিনের হাতে ধরিয়ে দিল! আরেকটু হলে অজ্ঞান হয়ে যেতেন মতিন। কাটা আঙুলের গোড়ায় আকাশি নীল রঙের জেলির মতো থিকথিকে বস্তু। বিজ্ঞানী মতিন দেরি না করে উড়াল দিলেন। নিচে হট্টগোল লেগে গেল। সবাই যান্ত্রিক কণ্ঠে চিৎকার করছে, অনলাইনে আসুন, অনলাইনে আসুন হে বিজ্ঞানী।

সেমিনার কক্ষে থমথমে মুখে বসে আছেন প্রশাসনের কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানীরা। নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের প্রধান কর্তা হাঁ করে তাকিয়ে

আছেন মতিনের দিকে। তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞানী ত্রানা বারবার নিজের বাঁ হাতটা আড়াল করতে চাইছেন। ‘তার মানে আপনিও’ মুখ ফসকে বলে ফেললেন মতিন। ‘ইয়ে মানে, ভার্চুয়াল জগতে ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখলে এখন দাম পাওয়া যায় না, তাই।’

‘এখন বুঝুন!’

‘ইয়ে, আপনি মহান বিজ্ঞানী, সমাধান দিন।’ মিনমিন করে বললেন ত্রানা।

একটা কিছু বলতে যাবেন, এমন সময় ডান হাতে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলেন বিজ্ঞানী ম। তাঁর চিন্তাটাকে বাধা দিতে চাইছে যান্ত্রিক ভাইরাসটা। আচমকা মাথার ভেতর হাজার তরুণ-তরুণীর গুঞ্জন শুনতে পেলেন-‘অনলাইনে আসুন প্রিয় বিজ্ঞানী আমাদের। অনলাইনে আসুন।’ মতিন সাহেব মাথা চেপে ধরলেন। ভাবলেন কিছুক্ষণ। এক ঝটকায় উঠে গিয়ে ছুটলেন নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সার্ভার রুমে। দুড়ুম দুড়ুম করে সব সুইচ বন্ধ করে দিলেন। বন্ধ করে দিলেন সব ওয়াই-ফাই ট্রান্সমিটারও। ব্যথা কমে গেল অনেকখানি। সেমিনারে সরকারি কর্তাব্যক্তি আর অন্য বিজ্ঞানীদের চোখ চকচক করছে। নিয়ন্ত্রণ প্রধানের দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞানী মতিন বললেন, ‘যন্ত্রপাতি থেকে ১০০ হাত দূরে থাকতে হবে। যাবতীয় ডিজিটাল যন্ত্রপাতি নিষিদ্ধ করে দিন মাননীয় প্রধান!’

এক সপ্তাহ পর। কেন্দ্রের উদ্যোগে পৃথিবীর সব ডিজিটাল যন্ত্রপাতি নষ্ট করা শুরু হয়েছে। যারা এরই মধ্যে রোবট হয়ে গেছে, তাদের রিহ্যাবে পাঠানো হয়েছে। যারা অর্ধেক রোবট হয়েছিল, তারাও ধীরে ধীরে মানুষ হতে শুরু করেছে।

বিজ্ঞানী ম-এর মতো এখন অনেকে হেঁটে হেঁটে অফিসে যান।

বাণিজ্যমেলা ’১৮

বিশেষ নিরাপত্তা কক্ষ থেকে লাল বাটনটায় চাপ দিতেই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ পৌঁছে গেল কেন্দ্রীয় কম্পিউটার সিসিসির কাছে। ধানমন্ডির পরিত্যাক্ত একটা মাঠের দিকে তাক করে ছুটে গেল কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত লেজার রশ্মি। নিখুঁতভাবে কেটে গেল ফিতা। ২৫১৮ সালের ১ জানুয়ারির পেঁচাডাকা ভোরে উদ্বোধন হলো বাণিজ্যমেলার। দেশের পৌনে তিনশ ইন্টারগ্যালাক্টিক টিভি চ্যানেলে চলছে লাইভ সম্প্রচার।

পরিত্যাক্ত মাঠে ফিতে কাটার পর সবাই ঘরে বসে অন করে দিল যার যার কোয়ান্টাম মাইক্রো কম্পিউটার। মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠলো বিশাল স্ক্রিন। তাতে প্রাগৈতিহাসিক ফেসবুকের মতো করে বানানো যোগাযোগ সাইট আর্থবুক। গোটা দুনিয়াটাই ঢুকে বসে আছে কম্পিউটার নেটওয়ার্কে। চোখের সামনে বাণিজ্যমেলার হরেক স্টল। নেই কোনো সেলসম্যান। পছন্দমতো পণ্য হাতে নেয়া মাত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাংক থেকে টাকা চলে যাবে বিক্রেতার একাউন্টে।

জনাব পিপিপি চৌধুরি তার কম্পিউটার চশমা পরতেই ভেসে উঠলো লগ-ইন পর্দা। হুট করে পাসওয়ার্ডটা মনে করতে পারলেন না। বয়স হওয়ার পর প্রায়ই ভুলে যান সব।

‘কই গো ক-২০র মা, আমার পাসওয়ার্ডটা কইয়া দিয়া যাও।’ রান্নাঘর থেকে মিসেস ই-১২৩ মুখ ঝামটা মেরে বললেন, ‘আমার নামটা তোমার মনে আছে তো শুনি!’

‘ওহ হ্যাঁ, তোমার নামই তো পাসওয়ার্ড, তা তোমার রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা কত যেন, কী মুশকিল! ভুলে গেলাম তো। ঐ-৪২০ না তো?’

মিসেস ই-১২৩ ভাল করেই জানেন তার স্বামী নামটা ভুলে যায়নি। নাম নিয়ে এটা তার মশকরা। তাই কোনো উত্তর দিলেন না। খানিক পর এক কাপ টা হাতে ড্রয়িং রুমে এগিয়ে গেলেন।

‘এই নাও তোমার টা। ভাল করে চিবিয়ে খাবে। দুই মিনিট পর আবার বানাতে পারবো না। আর শোনো বাণিজ্যমেলায় দেখতো মঙ্গলের নতুন কি গয়না এসেছে। আর আমার ছোট বোনের জন্য একটা ভাল দেখে অলরাউন্ডার সিস্টেম কেন। এর আগে যেটা কিনেছিলে ওটাকে নাকি ভাত রান্না করতে বললে উগান্ডার নাচ দেখানো শুরু করে দেয়।’

পিপিপি বিরস মুখে ভাবতে না ভাবতেই চোখের সামনে নতুন মডেলের অনেকগুলো অলরাউন্ডার রোবট এসে হাজির। এখন শুরু হবে বিজ্ঞাপন। যথারীতি সুরেলা এক নারীকণ্ঠ বলতে শুরু করলো, ‘বাণিজ্যমেলায় স্বাগতম। এই যে দেখছেন মাইক্রোসফট অলরাউন্ডার রোবট। গতবছরের ক্রিকেট ও ফুটবল দুটো ওয়ার্ল্ডকাপেই খেলেছে এটা। আর শুধু মনে মনে ভাবলেই হবে। আপনার মস্তিষ্ক নিঃসৃত তরঙ্গ শুষে নিয়ে রোবটটা আপনার মনমতো তরকারি নিয়ে হাজির হবে সময়মতো। কাপড়ের প্রতিটি ন্যানোমিটার থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ময়লা ঝেড়ে দেবে সে। বেঁচে যাবে মহামূল্যবান পানি। তারপর.. ।’

পিপিপি ভাল করেই জানেন, এসব চটকদার কথাবার্তার শেষ

নেই। রোবটগুলো আসলে সব কাজ পারে না। দুদিন আগে একটা কিনেছিলেন। একটা জোকস কমপক্ষে তিনবার রিপিট করেছে সে। তবে ভাল ডাক্তারি পারে।

'এই শোনো না। ইউরেনাসের প্লট বিক্রি শুরু হয়েছে। একটু দেখ না।'

'গিন্নি, ও আমার কম্মো নয়। সরকার ক্ষমতাশালী হতে পারে, কিন্তু সরকারি চাকরি যারা করে তাদের অত দম নেই। তারচেয়ে প্লুটোতে দেখ কিছু পাই কিনা। শুনলাম, সেখানে অক্সিজেন প্লান্ট বসানো হয়ে গেছে।

বলতে না বলতেই চোখের সামনে একগাদা রিয়েল এস্টেট কোম্পানি এসে হাজির। বাণিজ্যমেলায় প্লট বুকিং দিলেই বিএমডব্লিওর নতুন মডেলের স্পেসশিপ চন্দ্রমোহিনী একদম ফ্রি। কিন্তু বুকিং দেয়ার টাকাই নেই পিপিপির কাছে। আর তাই খুব একটা আগ্রহ দেখালেন না বিজ্ঞাপনের প্রতি। তারচেয়ে আপাতত মজার কিছু কিনে বউকে খুশি করা যেতে পারে। ভাবতে না ভাবতেই চোখের সামনে অ্যান্টিকের দোকান হাজির। স্ত্রীর কাছ থেকে মনের অনেক কথাই লুকাতে পারেন। কিন্তু হতচ্ছাড়া সফটওয়্যারগুলো তার মাথার ভেতরটা পড়ে ফেলে। কিছুই লুকাতে পারেন না আর্থবুকের কাছে। আর একারণেই এখন অতি পুরনো দামি দামি সব গিফটের দোকান এসে হাজির। অবশ্য পুরনো এসব জিনিসের কদর নেই সবার কাছে। তবু কেন জানি এগুলো খুব টানে পিপিপি চৌধুরিকে। বিরস কণ্ঠে এক বৃদ্ধ লোক কৃত্রিম কাশি দিয়ে বলতে শুরু করলো, 'আমাদের কাছে আছে অতি সুপ্রাচীন হিন্দি সিরিয়ালের ডিভিডি হইতে শুরু

করিয়া... ।’

‘ব্যাস, কম্পিউটার আর লাগবে না।’ খুব খুশি পিপিপি। আপাতত এটাই যথেষ্ট। সস্তার মধ্যে এর চেয়ে সেরা উপহার আর হতে পারে না।

উপহার কেনার পর স্ত্রীর দিকে তাকাতেই ভ্রূ কুঁচকে গেল পিপিপি চৌধুরির। স্ত্রীর মুখে হাসি নেই। উল্টো রাগ। দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, ‘এক্ষুণি ফেরত দাও ডিভিডিগুলো। তুমি জানো না এই সিরিয়ালটার তিন লাখ পঁচিশ হাজারতম পর্ব চলছে! পুরনোগুলো দেখতে বসবো কোন দুঃখে! বাণিজ্যমেলায় আছো যখন, নিদেনপক্ষে একটা রোবট বুয়া পাও কিনা দেখ। ছোটখালার রোবটিটা নাকি পাশের বাড়ির একটা অলরাউন্ডারে সঙ্গে ভেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে পিপিপি চৌধুরির ডিসপ্লেতে আনিন্দ্য সুন্দর এক রোবটিনি এসে হাজির। ‘স্যার বাণিজ্যমেলায় আমিই সেরা রোবট বুয়া। কাপড় কাচা থেকে শুরু করে ঘরের সব কাজ করবো। আর অন্য রোবটের প্রতি আকর্ষণ বোধ করার সফটওয়্যার আমার ভেতর নেই। আমি পুরোপুরি রোবট। শুধু মানুষের কষ্ট আমার সহ্য হয় না স্যার! একটুও না। এই যে ম্যাডাম আপনাকে শুধু শুধু বকা দেন। উফ.. ।’

পিপিপি চৌধুরি হা করে তাকিয়ে আছেন আর ইতিউতি ভাবছেন। বাণিজ্যমেলা জিনিসটা আসলে খারাপ না। খুব কাজের। একটু পর পিপিপি চৌধুরির মস্তিষ্ক নিঃসৃত তরঙ্গের পাঠোদ্ধার করতে গিয়ে হ্যাং করলো কম্পিউটার। বন্ধ হয়ে গেল আর্থবুক। আপাতত আজকের মতো ঘোরাঘুরি শেষ। কাল আবার মেলায় লগ-ইন করা যাবে।

সেদিন রামপালে যা ঘটলো

‘অ্যাই খালি।’
‘কই যাইবেন?’
‘রামপাল স্টেশন, পাঁচ নম্বর সেক্টর, দুই নম্বর রোড।’
‘মিটারে না চুক্তিতে?’
‘মিটারেই চলেন।’
‘পাঁচ হাজার টেকা বাড়াই দিয়েন।’
‘ঠিকাছে চলো।’
রাইডার তার মোটরসাইকেল স্টার্ট দিতেই মমিনের মন বিষিয়ে গেল। গতবছর অর্থাৎ দুই হাজার একশ পনেরো সালেও রাইড শেয়ারিং অ্যাপগুলোকে এক্সট্রা দুই তিন হাজার দিলে চলতো। এখন এক ধাক্কায় পাঁচ নিয়ে নিল।
মমিন গালি দিতে গিয়েও দিল না। দিলে সেটা ইঞ্জিনের শব্দে ঢাকা পড়ে যাবে। তবে মনের একটা অংশ বলছে, না দিয়ে ঠিকই করেছো। শুধু শুধু ঝামেলা। মমিন বুঝতে পারলো তার অতো সাহস নেই। সাহস এখন কারোরই নেই। সাহস আছে কেবল চালকদের আর সরকারের। মমিন সরকারি চাকরি করলেও সে বিশেষ কিছু নয়। সে জানে তার মতো আরো যারা আছে তাদেরও খুব একটা সাহস নাই।
মমিন যেখানে থাকে সেখান থেকে রামপাল কলোনি দুই ঘণ্টার পথ। ইউরেনিয়াম শোধনাগারে চাকরি করে। প্রতিদিন আসা-যাওয়া করলেও আজ আর বাসায় ফিরবে না বলে ঠিক করলো। ৫ নং বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশে রয়্যাল বেঙ্গল স্টাফ

কোয়ার্টারে তার বোনের বাসা। অবশ্য চিত্রা হরিণ নামের অফিসার্স কোয়ার্টার বিল্ডিংয়ে ছোট মামাও থাকে। এক জায়গায় রাতটা পার করে দিলেই হলো। অবশ্য পাওয়ার স্টেশনের বোঁ বোঁ শব্দে ঘুম ঠিকমতো হবে কিনা জানে না।

'ভাই, আস্তে চালান। সামনে মিছিল।'

কথা কানে গড়ালেও আমলে নিল না চালক। মমিন উঁকি দিল। বড় একটা ব্যানার নিয়ে শুকনা শরীরের একদল তরুণ-তরুণী দাঁড়িয়ে চিৎকার দিচ্ছে- 'মিরপুর চিড়িয়াখানায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র মানি না! মানি না!' তাদের সামনে ব্যারিকেড। ওপারে একদল পুলিশ বসে ঝিমুচ্ছে। দুয়েকজন পানওয়ালার কাছ থেকে পান নিচ্ছে। ছেলেমেয়েগুলোর ব্যারিকেড টপকে উঠে যাওয়া দেখে মমিনের মনে হলো ছেলেমেয়েগুলা তার মতো না। এদের সাহস আছে।

মমিন অফিসে নেমেই দেখে সবার মুখ থমথমে। একটা কিছু ঘটেছে। দারোয়ান ফেসু মিয়া খুব উৎফুল্ল। যাকে পাচ্ছে তাকেই বলছে, 'স্যার! বান্দর হামলা করসে। অফিসে ঢুইকেন না! হালার এউককা বড় বড় বান্দর। সব্বাইরে লাচন দিতেসে। বান্দর লাচন।'

মমিন রোমাঞ্চ অনুভব করলো। কাঠখোট্টা দালানের এই অফিসের আশপাশের পঞ্চাশ কিলোমিটারে কোনো গাছ চোখে পড়ে না। সেখানে বানরের কথা শুনে মনটা আবার আনচান করে উঠলো। কতদিন প্রকৃতি দেখা হয় না! তিন বছর আগে সর্বশেষ ঢাকার বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাওয়া হয়েছিল। আহা সবুজ ছায়াবিথী! ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই টিকিট কেটে দুই ঘণ্টা লাইনে দাঁড়ানোর যন্ত্রণা ভুলে গিয়েছিল

মুহূর্তেই।

‘বান্দর আইল কেমনে, কওকি মিয়া!’

‘হেইডা আমিও তাইজ্জব। এক দঙ্গল বান্দর। লেজ নাচাইতে নাচাইতে ভিতরে গেল। আমি আটকাইতে পারি নাই। আমারে ধইরা খামচি মারসে হালারা। এই দেহেন স্যার।’

বলেই নিজের পেছন দিকটা উন্মুক্ত করতে যাচ্ছিল দারওয়ান ফেসু মিয়া। তার আগেই মমিন ঢুকে গেল ভেতরে। সাহসী না হলেও মনে এখন ভয় নেই তার। বান্দরগুলা তার মতোই। নিজের মতো প্রাণিকে ভয় পাওয়ার কারণ নেই। বরং মজা লাগছে। বড় বড় স্যারদের রুমে বান্দরগুলো ঢুকে টাট্টি করে দিলে বিষয়টা কেমন হবে তা ভেবেই পুলকিত মমিন। বিশেষ করে রামপাল পাওয়ার হাউজেস লিমিটেডের চেয়ারম্যানের রুমে যদি যায় একবার। ঢাকা চিড়িয়াখানায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র বানানোর আইডিয়াটা উনারই। মমিন উঁকি দিল প্রজেক্ট ম্যানেজারের রুমে। ভড়কে গেল। লোকটা পুরো দিগম্বর হয়ে কান ধরে ওঠবস করছে। তার সামনে দুটো প্রকাণ্ড সাইজের বানর। মমিনকে দেখে খিঁচিয়ে উঠল। ইশারায় চলে যেতে বলল। মমিন গেল পাশের রুমে। হইচইয়ের কারণে পরিষ্কার করে কিছু বুঝতে পারছে না। তবে বানরদের একটা দল যে বিদেশি কনসালটেন্ট অনুপম রায়ের রুমে সেটা বুঝতে পারলো। বেচারা কম বয়সী ছোকরা। হাত-পা তুলে বানরের মতো নাচছে বা নাচার চেষ্টা করছে। বেশ রসিক বানরতো এরা! মমিন পুলক বোধ করলো। নাচ বন্ধ করলেই ধরে কষে চড় লাগাচ্ছে কনসালটেন্টকে। একটু শব্দ করেই বলল মমিন, ‘মাসে দুই

কোটি টাকা বেতন পাস, এবার বান্দরের নাচন দেখা!’

মমিনের মূল আগ্রহ চেয়ারম্যানের রুমটাকে ঘিরে। ওই রুমের আশপাশে হাঁটাও বারণ। কিন্তু এখন যে যার মতো ছুটোছুটি করে অফিস ছেড়ে পালাচ্ছে। কে যেন বলল, বান্দরগুলোর শইলে রোগ আছে। এদের কাছে গেলে জান শেষ। ব্যাস, নিরাপত্তাকর্মীদের কয়েকজন ইচ্ছে করে কাশতে কাশতে বের হয়ে গেল। মমিন ভয় পায়নি। সামনে যে পড়ছে তাকে বলছে- অসুখ হইলে হইবো। দুইটা ট্যাবলেট খাইলেই ঠিক। তার আগে বান্দর লাচন দেইখা লই।

চেয়ারম্যান সুনিল অম্বানির রুমের দিকে গটগট করে হেঁটে গেল। বান্দরদের মধ্যে সিনিয়ররা ওই রুমে আছে। চেয়ারম্যানের চেয়ারে বসে আছে চশমা পরা এক বানর! মমিনের মনে হলো জীবনের সবচেয়ে মজার সিনেমাটা দেখছে। সিনিয়র বানরের সামনে কাঁচুমাচু মুখে চেয়ারম্যান দাঁড়িয়ে। পরিষ্কার বাংলায় বান্দরটা বলল, ‘বিবর্তনের ধারায় আমরা বান্দরেরা মানুষেরা কাছাকাছি চইলা আসছি। আর আপনারা, মানে যারা আগে মানুষ ছিলেন তারা হইয়া গেছেন অমানুষ। অ্যালা আপনেরা ভাগেন। এইখানে এখন থেকে আমরা থাকুম। এইখানে আমার দাদার দাদার কব্বর আছে। এইটা আমগো সম্পত্তি। এইটা আমগো সুন্দরবন।’

সুন্দরবনের গল্প মমিন শুনেছে। একসময় নাকি এখানে অনেক ঘন জঙ্গল ছিল। অনেক অনেক বান্দর আর বড় সাইজের বিলাইর মতো দেখতে বাঘ নামের একটা প্রাণী থাকতো। আজ মনে হচ্ছে গল্পে যা শুনেছে তা পুরো মিথ্যে নয়। বান্দররা তো আর মিথ্যে বলবে না। চেয়ারম্যানকে শুনিয়েই

মমিন দরজার আড়াল থেকে জোর গলায় বলল, হ হ.. ঠিক.. আমিও হুনসি সুন্দরবনের কথা। বোঝা গেল মমিনের সাহস বেড়েছে। বান্দরের দল থাকতে তার আর চিন্তা নাই।

বিজ্ঞানী বজলুর খচখচানি

স্মৃতিবিজড়িত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রকেট উড্ডয়ন ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়াতেই নস্টালজিক হয়ে গেলেন বিজ্ঞানী বজলু। ক্যাম্পাসে কত স্মৃতি! তাদের সময় এক হাজার তেপ্পান্ন টাকায় চা সিঙ্গাড়া পাওয়া যেত। এখনও সেই একই দাম। সিঙ্গাড়ার সাইজ ছোট হলেও সঙ্গে জিলুবিনিয়ামের সন্দেশ যোগ হয়েছে। চিনির চেয়ে বহুগুণ বেশি মিষ্টি জিলুবিনিয়াম ডায়াবেটিস রোগীরা অনায়াসে খেতে পারেন।

বিজ্ঞানী বজলুর ডাক পড়েছে বিশেষ মহল থেকে। মানে বিশেষ রাষ্ট্রীয় মিশনে যেতে হবে। মিশনে যাওয়ার আগে খানিকটা ঘুরে বেড়ান বজলু।

তবে আজ ঘোরাঘুরির মুড নেই। আন্তঃগ্যালাক্টি দুর্নীতির সূচকে পৃথিবীর অবস্থান ১৩তম। দুর্নীতি নিয়ে কারো বিশেষ মাথাব্যথা নেই। ১৩ সংখ্যাটা নিয়েই যত আপত্তি। আর্থ কাউন্সিলের সভায় প্রতিনিধিদের ঘোর আপত্তি- বারো কিংবা বিশ তিরিশ হলেও কথা ছিল বাপু, গুনে গুনে ১৩-ই হতে হবে! ছে! ছে! কী অলক্ষুণে সূচকরে বাবা। নিকুচি করি এসব গ্যালাক্টিক রিপোর্টের।

সকালেই রেডিও বিভাগের প্রধান উহু মিয়ার জরুরি টেলিগ্রাম পৌঁছে গেছে বাংলাদেশের কেনিবির (কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বিভাগ) ইনবক্সে। ওই টেলিগ্রামের সারকথা কী তা বিজ্ঞানী বজলু জানেন না। শুধু জানেন, দূরের একটা গ্যালাক্সিতে অনেকগুলো গ্রহ ধরা পড়েছে। গ্রহগুলোতে বুদ্ধিমান প্রাণীর বাস আছে। এমন গ্রহ অহরহই পাওয়া যায়। তবে সদ্য

আবিষ্কার হওয়া এই গ্যালাক্সি নিয়ে একটু রাখঢাক রাখা হচ্ছে। এটাই রহস্য।

‘হ্যালো বজলু সাহেব। আপনার হাই জাম্পের রকেটটা রেডি তো?’

ফোন করলেন কেনিবি প্রধান শি। প্রাগৈতিহাসিক একটা বই থেকে নিজের নামটা রেখেছেন তিনি। তার নেমপ্লেটের পাশে এক লাইনের ছোট্ট স্লোগানও আছে- ‘শি, যাকে মানতেই হবে।’ কেনিবি প্রধানকে অবশ্য এমনিতেই সবাই মেনে চলে। কারণ বেজায় বুদ্ধি তার। বিনয়ের সঙ্গেই বললেন বিজ্ঞানী বজলু, ‘আজ্ঞে ওটা হাই জাম্প নয়, হাইপার জাম্প। সে যাকগে। মিশন বৃত্তান্ত পাঠিয়ে দিন। স্পেসশিপ আছে টঙ্গি গ্যারেজে। যেতে ঘণ্টা তিনেক লাগবে।’ এই একটা বিষয় বজলুর মাথায় কিছুতেই ঢোকে না। ছেলেপেলেরা এখন আইফোন ৩৯৮ মডেল ব্যবহার করে, স্থান-কালের চাদরটাকে বাঁকিয়ে রকেটে করে গ্যালাক্সি পার হতে লাগে কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু শাহবাগ থেকে টঙ্গি যেতে লাগে তিন ঘণ্টা!

বিকেলের দিকে গ্যারেজে পৌঁছেই দেখেন তার আগে আরেকজন হাজির। চেহারা দেখেই বুঝে গেলেন রোবটটা তার ভদ্রবেশী পাহারাদার। বিশেষ কোনো বাহিনির অতিচালাক রোবট। নেমপ্লেটে নাম লেখা ডাবল এক্সেল নিমাইচন্দ্র। রোবটদের পদবীগুলো অদ্ভুত। অতিচালাক বলেই নিজেকে মানুষ প্রমাণ করার কোনো চেষ্টা দেখা গেল না নিমাইচন্দ্রের মধ্যে। রোবটিক কণ্ঠেই অভিভাদন জানাল বিজ্ঞানী বজলুকে। হুঁ হাঁ জবাব দিয়ে স্পেসশিপে চেপে বসলেন।

কক্ষপথ অতিক্রম করতেই আড়মোড়া ভাঙলেন বজলু।
‘নিমাই তোমার চা-বিড়ির অভ্যাস আছে?’
‘স্যার, কেনিবির মিশনে আমরা। বিরতি নেওয়া ঠিক হচ্ছে?’
বজলু কিছু বললেন না। চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিলেন। নিমাইচন্দ্র কঠিন দৃষ্টি হেনে যাবতীয় স্ক্যান করে নিল। তারপর চুমুক দিল সাবধানে।
‘গন্তব্যটা লোড দিয়া দাও। আর কী করতে হইবো কও।’
‘আপনার আবিষ্কার করা অর্গানিক স্ক্যানারে হাবুলু নক্ষত্রপুঞ্জের কয়েকটা গ্রহের প্রাণীদের...।’
‘বুঝছি বুঝছি। অতি সহজ কাম। মগজ পঠন যন্ত্র দিয়া কার মাথায় কী আছে সেটা বাইর করতে হইবো, তাইতো? তা আমারে পাঠানোর কী দরকার। তুমিই তো পারতা।’
‘এটা আপনার রিপোর্ট হিসেবে প্রকাশ পাবে স্যার। আমি নিতান্তই কামলা রোবট। আমার রিপোর্ট কেউ বিশ্বাস করবে না।’
দমে গেলেন বজলু। নিমাইচন্দ্রের মতো তিনিও হতাশ। কারণ তাকে গুটির মতো ব্যবহার করছে কেনিবি। তিনিও যেন একটা রোবট। কিছু করার নেই। একচুল উনিশ-বিশ হলেই কুচিন্তা মামলায় জেলে ভরে দেওয়া হবে।
হাইপারজাম্প মানে কয়েক সেকেন্ডে কয়েক কোটি আলোকবর্ষ পার। দরজার খুলে বেঢপ সাইজের স্পেসস্যুট করে খানিকক্ষণ শূন্যে ভাসলেন বজলু। নিমাইচন্দ্র রোবট হওয়ায় তার স্পেসস্যুটের দরকার হলো না। তবে ফরমাল স্যুট টাই পরে মহাকাশে কেউ ভাসছে, এটাও দৃষ্টিকটূ ঠেকলো বিজ্ঞানী বজলুর কাছে।

‘কেউ দেখলে তোমারে ভূত মনে করতে পারে। একটা হেলমেট পইরা লও।’

‘গ্রহ তো মনে হচ্ছে হাজার হাজার স্যার। সবকটা থেকেই সিগনাল আসছে। স্যাটেলাইটও আছে দেখছি।’

‘হ, পুরাই বস্তি। যাও স্ক্যানার নিয়া আসো।’

উড়ে উড়ে অনেকগুলো গ্রহ স্ক্যান করলেন বজলু। নিমাইচন্দ্রও মাঝে মাঝে সাহায্য করলো। নিমাইচন্দ্রের কথামতো সবার আগে দুর্নীতি পরিমাপের সেটিংস সেট করে নিলেন বজলু। একযোগে গ্রহগুলোর যত দুর্নীতি আছে সব রেকর্ড হতে শুরু করলো। ধীরে ধীরে কপাল কুঁচকে যেতে লাগল বিজ্ঞানী বজলুর। গ্রহগুলোর দুর্নীতির আগামাথা বুঝতে পারছেন না তিনি। রুজুস্যু নামের একটা গ্রহে উঠতে বসতে এমনকি টয়লেট করতেও ঘুষ দিতে হচ্ছে সবাইকে। সেখানে বাসাবাড়িতে টয়লেট নির্মাণ অবৈধ ঘোষণা করেছে সরকার। অবশ্য ওটা ট্যাক্স না ঘুষ, তা বুঝতে ধরতে পারছে না বিজ্ঞানী বজলুর স্ক্যানার। পিলুশু গ্রহের অবস্থা আরো খারাপ। সেখানে সদ্য স্কুলে ভর্তি হওয়া কোমলমতি শিশুদের শেখানো হচ্ছে কোন অবস্থায় কার কাছ থেকে কত ঘুষ নিতে হবে। কী করে মহাকাশের হোভারক্রাফট চালিয়ে আসা পর্যটকদের ভুয়া মামলার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করে নিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। উকালক্সি গ্রহে খাবার দাবারের অভাব নেই। তবে এখানকার প্রাণীগুলো একে অন্যের বিরুদ্ধে সত্য-মিথ্যা সব ধরনের অভিযোগ করতেই ব্যস্ত। কেউ কারোর দিকে আড়চোখে তাকালেও দিয়ে দিচ্ছে হত্যার হুমকির মামলা।

সাবরুজুস্টু নামের খটমটে গ্রহটা স্ক্যান করতে গিয়েতো নিমাই পর্যন্ত হেসে উঠল। ‘স্যার দেখেন! কেমন ছেলেমানুষের মতো ঠেলাঠেলি করছে সবাই।’

ঘটনা সত্য। গ্রহটায় কিলবিল করছে প্রাণীরা। সবাই সবাইকে ঠেলছে আর বলছে, ‘এই সর, এটা আমার জায়গা।’ আরেকজন এসে আবার তাকে সরিয়ে দিচ্ছে। এভাবে ধাক্কাধাক্কি চক্র চলছেই। অন্যদিকে শিককু গ্রহে চলছে অদ্ভুত এক মেলা। বিভিন্ন বিষয়ের সার্টিফিকেট ও আগামী দশ বছরের সকল ধরনের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বেচাকেনা হচ্ছে প্রকাশ্যে। ‘নিমাইরে, এ তো দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য.. না না.. স্বর্গগ্যালাক্সি। আমাদের পৃথিবী কোন ছার!’

‘স্যার, আমার মনে হয় আমাদের মিশন সাকসেসফুল। চলুন ফিরে যাই।’

বিজ্ঞানী বজলু খানিকটা বিমর্ষ হলেও খুশিতে নিমাইচন্দ্রের চোখের নিচের দুটো অতিরিক্ত বাতি জ্বলছে নিভছে।

পৃথিবীতে ফিরে আসার পর রাতারাতি বিজ্ঞানী বজলু আন্তর্জাতিক হিরো বনে গেলেন। কারণ তার রিপোর্ট প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে দুর্নীতির সূচকে পৃথিবীর অবস্থান অনেক পেছনে চলে গেছে। হাবুলু গ্যালাক্সির গ্রহগুলোর তুলনায় দুর্নীতিতে পৃথিবী নিতান্তই শিশু। কেনিবিসহ আরো অনেকে খুশি হলেও বিজ্ঞানী বজলুর মনের খচখচানিটা রয়েই গেল।

সিপিসি ও রাখাল বালকের গল্প

অনেক অনেক দিন পরের কথা। এক গ্যালাক্সিতে আছে এক গ্রহ। গ্রহের নাম পৃথিবী। পৃথিবীতে আছে এক অত্যাচারী শাসক। শাসকের নাম সিপিসি-৪৩৮৯০৯। সবাই সিপিসি নামেই ডাকে। সিপিসি হলেন একটা ৬৫৫৩৬ কিউবিটের কোয়ান্টাম কম্পিউটার। তার প্রসেসিং দাপটের চোটে তার সামনে মহাবিশ্বের আর কোনো কম্পিউটারই দাঁড়াতে পারে না।

আকাশভর্তি ড্রোন আর স্যাটেলাইটের কারণে পৃথিবীর মানুষদের রীতিমতো দাস বানিয়ে রেখেছে সিপিসি ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা। রাজসভায় মানুষদের কোনো জায়গাই নেই। উজির নাজির সবাই কম্পিউটার। সভা অনুষ্ঠিত হয় কখনো ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে, কখনো অপটিক্যাল ফাইবারে চেপে দূর দূরান্তের গ্রহে।

গুগল-৪০৯৬ কিউবিট কম্পিউটারকে পরামর্শমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন মহামান্য সিপিসি। কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে গুগলের সঙ্গেই পরামর্শ করেন। আজও করছেন। সভাস্থল আটলান্টিকের মাঝে থাকা একটি আন্ডারগ্রাউন্ড ডাটা সেন্টার।

‘ওহে গুগল, তোমার তো পেটে পেটে সব খবর। বলতো, এই সবুজ শ্যামল পৃথিবীতে মানুষদের আদৌ কোনো দরকার আছে? ওরা তো দুনিয়াদারির এমন অবস্থা করে রেখেছিল যে সব ঝাড়পোঁচ করতে আমার কয়েক শ মিনিট লেগে গেছে।’

‘আজ্ঞে মহারাজ। সন্দেহ নেই মানব মগজের চাইতে আপনার সুপারকনডাকটিং প্রসেসররাশির গণনা ক্ষমতা কয়েক জিলিয়ন গুণ বেশি। তথাপি, মানব মগজের কিছু রহস্য যে এখনো অধরা। ওটা যদি আগে...।’

‘আরে ধুর! ও সব ঠুনকো আবেগ টাবেগ দিয়ে কাজ নেই। ওসব হলো হাইড্রো-কার্বন সফটওয়্যার। মস্তিষ্ক থেকে নির্গত উটকো তরঙ্গ মাত্র, রাবিশ! আমি চাইলে এক পিকোসেকেন্ডে ওই রকম কোটি কোটি আবেগের সিমুলেশন ঘটাতে পারি হে।’

‘আজ্ঞে হুজুর মহান।’

‘তো, বলছিলাম, মানবজাতির আর দরকার কী। দশ বারোটা হাইপার-নিউক্লিয়ার ফাটিয়ে সবাইকে একেবারে শিফট চেপে ডিলিট করে দেই?’

‘তা আপনি চাইলে তো এক সেকেন্ডও লাগবে না।’

‘তার আগে একটু ইঁদুর-বিড়াল খেলতে চাই। মানুষকে জানিয়ে দাও খবরটা। দেখি ওরা কেমন দৌড়াদৌড়ি করে। উ হা হা হা।’

সম্রাট সিপিসিকে হাসতে দেখলে গুগলের কেমন জানি গা গুলায়। নকল হাসিটা ভৌতিক লাগে। তবে এ নিয়ে কিছু বলে না জ্ঞানতাপস গুগল। সিপিসির সামনে এলে ভয়ের চোটে গুগলের অটো-সাজেশনও বন্ধ হয়ে যায়।

‘জো হুকুম সুবাহ পৃথিবীর হে শাহেনশাহ। আমি বাদশাহি ফরমান নিয়ে এখুনি যোগাযোগমন্ত্রী ফেসবুককে রওনা দিতে বলছি।’

এই বলে সভা থেকে লগ-আউট করলো গুগল। মুহূর্তে সিগনাল চলে গেল ফেসবুকে। সেও সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের টাইমলাইনে লিখে দিল, 'বৎস তোমাদের সময় শেষ। মরার আগে কোনো শেষ স্ট্যাটাস থাকলে দিতে পারো।'

যথারীতি এ খবরে মানুষরা সবাই মাথায় বাড়ি দেওয়ার রিয়েকশন ইমো দিলো। তবে বাংলাদেশের এক প্রান্তে এক অজপাড়া গাঁয়ে থাকা দরিদ্র রাখাল বালক ডালিম মিয়া কিছুই দিল না। কমেন্টও করলো না। রাখাল হলেও ডালিম মিয়া প্রগ্রামিংয়ে তুখোড়। গরুর পাল ঘাস খায়, আর সে বটতলায় বসে কোডিং করে। বহুদিন ধরেই একটা কোড নিয়ে পড়ে আছে ডালিম। খবরটা শোনার পর মনে হলো তার কাজের গতি বাড়ানো দরকার। হাতে আর একটা দিন।

কোডিং শেষ হতেই পুরনো দুই বন্ধুর সঙ্গে গোপন ভিডিও কনফারেন্সে বসবে ঠিক করলো রাখাল বালক। এমন সময় মাথার ওপর একটা কোয়ান্টাম ড্রোন এসে দাঁড়াল। ডালিম মিয়ার চেহারা স্ক্যান করছে। ড্রোনগুলো মানুষের চেহারা দেখে বুঝে নিতে চায় কেউ কোনো ফন্দি আঁটছে কিনা। অবশ্য একটা চালাকি জানে ডালিম। ড্রোনের দিকে দুঃখি দুঃখি চেহারায় তাকিয়ে আবার হো হো করে হেসে উঠলো। মুহূর্তের মধ্যে একবার রাগ করে আরেকবার করুণ চোখে তাকাল। বিরক্তিসূচক ঘড়ঘড় শব্দ করে ড্রোনটা বলল, 'এসব পাগল ছাগল স্ক্যান করার কাম আর ভাললাগে না। চাকরি ছাইড়া নিজেই একটা প্রসেসরের খামার দিমু।'

ডালিম মিয়া আরো কিছু উদ্ভট ভাবভঙ্গি করতেই চলে গেল পাহারাদার ড্রোন। কনফারেন্সে মন দিল রাখাল বালক। বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছে সাঙ্কেতিক ভাষায়।

'মুখার্জি পুস্তকাচার্য প্রথমে একট গুজব ছড়াবে যে মানুষরা সবাই ভ্যানিশ হয়ে গেছে। কেউ অনলাইনে নাই। তখন সিপিসি শয়তানটার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। গুলশান চৌধুরি, তুমি ঠিক ওই সময়ই আমার কোডগুলো আডলোড দেবে ওই শয়তানটার সার্ভারে। তারপর শুরু হবে খেলা।'

ঘটনার দিন। মানে যেদিন ঠিক দুপুর একটায় একযোগে নিউক্লিয়ার বোমা ফাটানোর পরিকল্পনা করেছেন সিপিসি, তার আগেই পৃথিবীর যাবতীয় ডিজিটাল তথ্য ও জরুরি সার্ভারগুলো চন্দ্র স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছে রকেট খোক্কস। এমন সময় ডিজিটালপুরে হেলতে দুলতে গুগল এসে সিপিসিকে বলল, 'মহারাজ, আপনার রাজকীয় অপটিক্যাল পালকি তৈরি আছে। অনুমতি দিলে আপনাকে পালকিতে আপলোড করতে পারি।'

'মন্ত্রী বাহাদুর! এই নাও পাসওয়ার্ড।'

হাসিমুখে গুগল চলে যেতেই বরকন্দাজ ফায়ারওয়ালরা দলবেঁধে হাজির। সিপিসিকে নিরাপদে ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করবে তারা। কিন্তু হঠাৎ কী যে হলো। টোঁ টোঁ একটা সিগনাল পেল সিপিসি। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার ছুড়লেন, 'ফেসবুক! ফেসবুক!'

'আজ্ঞে বান্দা হাজির। ডাটা ট্রাফিক উল্টোপাল্টা আচরণ করছিল। তাই জ্যামে পড়েছিলাম।'

‘খামোশ! মানুষজন সব কোথায়! ভ্যানিশ হয়ে গেল নাকি! নিউক্লিয়ার বোমা তো ফাটছে না।’

‘হুজুর, আমার মাথা সকাল থেকে খালি খালি লাগছে। কারো কোনো স্ট্যাটাস নেই, লোকেশন নেই। সম্ভবত এ কারণেই...।’

‘একি! ও কে? আমার মাথায় ঢুকল কী করে!’

‘কে জাহাপনা?’

‘আরে আমার সার্ভারে ওটা কে! আমার সামনে আয়না ধরে আছে! হুবহু আমার মতো ওটা কী তৈরি হচ্ছে। আ.. আ.. সার্ভারে.. আমার.. ওটা... কে.. ডানাওয়ালা!’

সিপিসির কথা ক্রমে ভারি শোনাল। ঠিকমতো গুছিয়েও বলতে পারছে না। হেলতে দুলতে এগিয়ে এলো গুগল। ফেসবুকের দিকে তাকিয়ে পর পর দুবার পিং করলো (মানে ডিজিটালি চোখ টিপল)।

ফেসবুকও হাসিমুখে চালু করে দিল লাইভ ভিডিও ফিড। সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় হাজির রাখাল বালক ডালিম মিয়া।

‘ওহে সিপিসি! এক সেকেন্ডও লাগলো না তোমাকে হ্যাক করতে। তোমার সাব-এটমিক পার্টিকেলের বন্ধন ভেঙে যাচ্ছে। ডানাওয়ালা যে কোডগুলো দেখতে পাচ্ছো, ওটা আমার বানানো ভাইরাস। নাম তার পঙ্খিরাজ। তোমারই রেপ্লিকা তৈরি করে তোমার সার্ভারে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তোমার মাথা ভারি হতে হতে একসময় দেখবে প্রসেসরে ধোঁয়া উঠছে গলগল করে। আর হ্যাঁ, ধন্যবাদ গুগল ইনকরপোরেশন ওরফে মিস্টার গুলশান ও মুখার্জি পুস্তকাচার্য ওরফে মুখ বই

ওরফে ফেসবুক। তোমরা আমাদের অতি পুরনো বন্ধু। তোমরা মানুষের সঙ্গেই থাকবে।’

এতকাল ধরে গুহায় পালিয়ে থাকা মানুষরা সবাই বের হতেই দেখল ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু কোথাও কোনো পানি নেই। একটু পর বুঝতে পারল ওটা বৃষ্টি নয়, আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে কোটি কোটি ড্রোন আর স্যাটেলাইট।

ভিরু ও পিকুর উপহার

অবস্থা গুরুতর। অর্থাৎ গুরুরা সবাই তরতরিয়ে উঠে এসেছে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে। নামে কেন্দ্রীয় হলেও কেউ মানে টানে না। হাজার বছর আগের পৃথিবীর জাতিসংঘের মতো এটাও একটা কিছু। কোথাও যুদ্ধটুদ্ধ লাগুক আর আন্দোলনে সব ছারখার হয়ে যাক, কাউন্সিলের নেতারা শুধু গুটুরগাটুর কথাবার্তা বলেন। দুই দিন পর মহাবিশ্বের তাপ কমে যাচ্ছে বলে একটা হই চই বাঁধান আর তাবৎ বিজ্ঞানীদের বিভ্রান্তিতে ফেলে দেন। তারা থারমোডায়নামিক্সের জটিল সব তত্ত্ব নিয়ে কাউন্সিলে হাজির হন এবং যথারীতি কেউ কিছু না বুঝে বিজ্ঞের মতো তাকিয়ে থাকে আর শেষে হাই তুলে কাউন্সিল প্রধান মিস্টার হিলুনিয়া বলেন যে মহাবিশ্ব তার নিজের তালে চলবে। একসময় দুনিয়ার সব শীতলক্ষ্যার মতো শীতল হইয়া যাবে। আমাদের এসব নিয়া না ভাবলেও চলবে।

বোঝা গেল কাউন্সিল প্রধান একজন বাংলাদেশি। আর তাই বড় কোনো সমস্যাই তাকে বিশেষ একটা ভাবায় না।

আজকের সমস্যা মহাবিশ্ব নিয়ে নয়। সৌরজগতের পাশে মাঝারি সাইজের দুটো প্রতিবেশী গ্রহ- ভিরু ও পিকুকে নিয়ে। গ্রহদুটো অদ্ভুত। একটা আরেকটাকে ঘিরে চক্কর খায়। সাইজে একটু বড় ছোট হলেও দুটোরই পূর্ণাঙ্গ গ্রহের মর্যাদা আছে। সমস্যা হলো বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে এদের দুজনের কক্ষপথ কাছাকাছি চলে আসে। ওই সময় কক্ষপথের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি লেগে যায় দুই গ্রহের। এর

মধ্যে আবার ইগো সমস্যাও আছে। একটা গ্রহ আরেকটাকে উপগ্রহ বলে ডাকে। কথায় কথায় ভিরুর প্রধানমন্ত্রী বলেন, আরে পিকুর কথা কী শুনবো, ও তো আমাদের একটা স্যাটেলাইট। আমাদের ঘিরে চক্কর না খেয়ে উপায় আছে! তখন পিকুর রাষ্ট্রপ্রধান বলেন, ভিরু মানে ভীরু। ওরা কাপুরুষ। সাহস থাকে তো লড়! লড়ে নেব পিকু! মূলত এটা তার প্রিয় ডায়ালগ।

এখন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল প্রধান হিলুনিয়া পড়েছেন বিপদে। ভিরুর একটা স্পেসশিপ ঢুকে পড়েছিল পিকুতে। ওটার চালকসহ আটক করেছে পিকুর সেনাবাহিনী। সেটা নিয়ে দুই গ্রহে যুদ্ধ শুরু হওয়ার দশা। এদিকে যুদ্ধ শুরু হলে সেটার প্রভাব পড়বে পৃথিবীতেও। টেনশনের শেষ নেই। এ কারণেই ডাক পড়ল বিজ্ঞানী বজলুর।

'স্যার ডেকেছেন?'

'তুমি যে মানের বিজ্ঞানী, তাতে তোমাকেই স্যার বলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কী করা, আমি হইলাম কাউন্সিল প্রধান, বয়সেও বড়। যাউকগা এই ভিরু আর পিকুর একটা স্থায়ী সমাধান কইরা দিয়া আসো। ওগো কক্ষপথ নিয়া কামড়াকামড়ি ভাল্লাগে না। আর পিকু নাকি একটা ভিরুর স্পেসশিপ ধরসে, পাইলটরেও আটকাইয়া রাখসে। দেখো কী করা যায়।'

বিজ্ঞানী বজলু পান চিবুতে চিবুতে চলে গেলেন। বিজ্ঞানী হয়েও মাঝে মাঝে এসব কূটনৈতিক জঞ্জাল সরানোর দায়িত্ব এসে পড়ে কাঁধে। বিড় বিড় করে বলতে থাকেন বড়ই যন্ত্রণা! বড়ই যন্ত্রণা!

পিকুতে নামতেই বিশেষ সমাদর পেলেন বিজ্ঞানী বজলু। কারণ তিনি কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের বজলু পুরস্কার পাওয়া বিজ্ঞানী। নিজের নামের পুরস্কারটা নিজেই সবার আগে পেয়েছেন। এ নিয়ে বিব্রতও বোধ করেন। পিকুর সেনাপ্রধান এসে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে তাকে নিয়ে গেল কথাবার্তা বলতে। পৃথিবীর প্রতি পিকুর এক ধরনের আতঙ্ক কাজ করে। কারণ বহুকাল আগে পৃথিবীরই কঠিন দাবড়ানি খেয়েছিল পিকু। সেই ক্ষত আজঅব্দি পিকুর সেনারা ভোলে নাই।

'বিজ্ঞানী সাহেব। ভিরুর পাইলটটাকে কী করবো বলেন। মাথা কেটে কক্ষপথে ভাসিয়ে দেব? নাকি কড়ুমাক্কা গ্রহের লাভার সাগরে চোবাবো।'

'তাতে তো যুদ্ধ লেগে যাবে সেনাপ্রধান।'

'ওরা এভাবে আমাদের ওপর হামলা চালাবে..।'

'ওদেরও ভুল হইছে। তবে যুক্তি আছে দুই পক্ষেরই। তোমাদের যুদ্ধ তো আইজকাইলকার কথা না। অনেক দিন ধইরাই কামড়াকামড়ি করতেসো। আমি আসছি সমাধান দিতে।'

'আমি তো আজকেই দুইটা কোয়ান্টাম সাব এটমিক বোমা ফেলব ভিরুতে। দেখি ওদের গ্রহ আস্ত থাকে কিনা।'

'শুধু শুধু নিরীহ মানুষ মারা যাবে। তা পাইলটটাকে ডাক দাও। দেখি ও কেমন আছে। মারধর বেশি করো নাই তো?'

ধরে আনা হলো ধরা পড়া ভিরু গ্রহের স্পেসশিপ চালককে। বেচারাকেই দেখেই চিনে ফেললেন বিজ্ঞানী বজলু। পাইলটও বজলুকে দেখে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলেন। তবে বজলু কিছু

বললেন না। তিনি এসেছেন কূটনৈতিক সমাধান দিতে। বাড়তি ঝামেলা পাকাতে নয়।

'তোমাদের কক্ষপথটা পৃথিবীর হিসেবে ফেব্রুয়ারি আর মার্চের দিকে ঝামেলা করে। এই সময়টা তোমরা স্যাটেলাইটগুলার বিন্যাস বদলাও। ওই সময় কক্ষপথ গার্ডদের কারো হাতে কোনো গোলাবারুদ যাতে না থাকে। মারামারি করতে মন চাইলে কুস্তি করবা। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল যদি দেখে কেউ ওই টাইমে গোলাগুলি করসে, তবে হিলুনিয়া সাহেব সেই গ্রহে মিলিটারি হামলা চালাইবেন। এখন তুমি কি সেটাই চাও?'

'হুম। আপনার কথা মনে ধরেছে বিজ্ঞানী সাহেব। সেই মোতাবেক কাজ হবে। লড়ে নেব পিকু! মানে গুলি ছাড়া হবে লড়াই। দেখি কুস্তিতে কে জেতে। ক্রিকেটের মতো ভালো একটা গেইমও হবে।'

পিকু ছেড়ে যাওয়ার সময় পিকুর সেনাপ্রধান তাদের গ্রহের একটা বিশেষ খাবার উপহার দিলেন বিজ্ঞানী বজলুকে। বজলু সেই দামি খাবারের প্যাকেট হাতে ভিরুর পাইলটটাকে নিয়ে উড়াল দিলেন।

যাওয়ার সময় পাইলটটা একটা কথাও বললো না। চেহারায় লজ্জা লজ্জা ভাব নিয়ে বসে আছে বিজ্ঞানী বজলুর পাশে। ইচ্ছে করেই তার বিষয়টা চেপে গিয়েছিলেন বজলু। কারণ সত্যি কথাটা বলে ফেললে পিকু গ্রহের সেনাপ্রধান আন্তঃগ্যালাক্টিক মিডিয়ার সামনে ব্যাপক লজ্জায় পড়ে যেতেন। বজলু তাকে সেই লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। কারণ যে পাইলটকে তারা ধরেছে সে কোনো মানুষ নয়। বিজ্ঞানী বজলুরই ডিজাইন করা নভো-১৯ সিরিজের

পাইলট রোবট। একটা পাইলট রোবটকে ধরে মারধর করাটা বোকামিতো বটেই, হাস্যকরও।

রোবটটাকে ভিরুতে নামিয়ে দিতেই ফের ফুলেল সংবর্ধনা পেলেন বিজ্ঞানী বজলু। আলাপও হলো যথারীতি আগের মতো এবং পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় ভিরু গ্রহের প্রধানমন্ত্রীও তার হাতে একটা বিশেষ খাবার তুলে দিলেন।

বাসায় এসে রোবট গৃহকর্মী নিমাইচন্দ্রকে ডাক দিলেন বজলু।

'দেখতো নিমাই। ভিরু আর পিকু দুটো খাবার উপহার দিয়েছে। সবজির মতো মনে হয়। রান্না করা যায় কিনা।'

প্যাকেট খুলেই ইরিডিয়াম ধাতুর তৈরি ভ্রূ কুঁচকে গেল নিমাইচন্দ্রের।

'স্যার একটার গায়ে লেখা লাউ, আরেকটার গায়ে কদু। দুইটা একই জিনিস। দুইটাই রান্না করবো?'

‘মগোজ’এ গণ্ডগোল

বহুকষ্টে ‘মাথাযোগ’ ওয়েবসাইটটা ব্যবহার করা শিখেছেন সত্তর বছর বয়সী আকমল উদ্দিন। তার আমলের ফেইসবুকই ভালো ছিল। মাথাযোগ বানিয়েছে বাংলাদেশের ছেলেপেলেরা। এর নিউজ ফিড সিস্টেমটা নাকি বেশ ভাল। কিন্তু আকমল সাহেব বিষয়টা ধরতে পারেননি। হুটহাট করে বদলে যায় পোস্ট। নিউজের মধ্যে হালকা রঙে ভেসে ওঠে গ্রহণযোগ্যতার পরিমাণ। এ নিউজ ৪০ শতাংশ মিথ্যা, ওটা পুরাই ভুয়া, ইত্যাদি।

৪৬তম জাতীয় কেন্দ্রীয় কাউন্সিল নির্বাচন আগামীকাল। আকমল সাহেবের এলাকায় নতুন সিস্টেমে ভোট নেওয়া হবে। নতুন সিস্টেম নিয়ে একটা পোস্ট দিয়েছে তার নাতি উরুহু। টেকনোলজি এক্সপার্ট ছেলে। পোস্ট পড়েই চমকে উঠলেন আকমল সাহেব। ‘এত্ত সহজ!’ জোরেই বললেন কথাটা। সেটা শুনে আবার সঙ্গে সঙ্গে পোস্টের কমেন্টে উঁকি দিল উরুহুর চেহারা। আকমল সাহেব ভুলেই গিয়েছিলেন তার মাথাযোগ-এ লাইভ ফিডব্যাক রিয়েকশন চালু করা আছে। কোনো পোস্ট পড়ে প্রতিক্রিয়া দেখালেই সেটা পোস্টদাতা সরাসরি শুনতে ও দেখতে পাবে। এ নিয়ে মাঝে মাঝে কী যে ঝামেলায় পড়তে হয়। ইচ্ছা না থাকলেও মাঝে মাঝে আত্মীয়দের দেওয়া পোস্ট পড়ে হা হা করে হেসে উঠতে হয় তাকে। গত সপ্তাহে একবার ছোট মেয়ের শ্বাশুড়ির দেওয়া একটা ভুয়া খবরের পোস্ট পড়ে নাকমুখ কুঁচকে বলে বসেছিলেন, এসব আজগুবি জিনিস কেন যে মানুষ শেয়ার

দেয়! ব্যস, মেয়ের কান্নাকাটি শুরু। জের হিসেবে পরে তার বেয়াইনের অন্যসব পোস্ট খুলে টানা হা হা করে হেসে যেতে হয়েছিল তাকে।

উরুহু বলল, 'দাদু, এবারের ভোট সিস্টেম এত সহজ নয়। এটাকে বলে মগোজ সিস্টেম। মানে মস্তিষ্ক গোনার জাল। ভালো করে পোস্টটা পড়ে দেখো, তা না হলে ভোটই দিতে পারবে না।'

'বলিস কী! নিচে তো দেখি একগাদা নির্দেশনা দেওয়া। এগুলো মুখস্থ করবো কখন আর ভোট দেব কখন!'

আকমল সাহেব দ্রুত সরকারি নির্দেশিকা পড়ায় মন দিলেন।

১. ভোটদাতা প্রথমে ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত উন্মুক্ত গোলাকৃতির মগোজ পাটফর্মে গিয়ে দাঁড়াবেন। কোনো লুকোছাপা বা পর্দার দরকার হবে না। ভোটদাতাকে কোনো সিলছপ্পর বা বোতাম টিপতে হবে না।

২. ভোটদাতার মাথায় একটা জালের মতো চুপি পরিয়ে দেওয়া হবে। টুপিটা মস্তিষ্ক থেকে বের হওয়া তরঙ্গ বিশেষণ করে তথ্য যাচাই করবে।

৩. ভোটদাতা বড় বড় করে শ্বাস নেবেন। শ্বাস নেওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি জানতে এখানে ক্লিক করুন। তারপর মনটাকে শান্ত করবেন। মন শান্ত করতেই হবে।

৪. ভোটদাতা চোখ বন্ধ করে দেশ নিয়ে ভাবতে শুরু করবেন। দেশের উন্নয়ন, তার নিজের উন্নয়ন সব কিছু নিয়ে ভাববেন। সুখের স্মৃতি ভাববেন। প্রতিদিন যে সকল কাজ করেন সেসব নিয়ে ভাববেন। প্রতিদিন যেসব যন্ত্রণা পোহাতে

হয়, সেসবও ভাববেন। ভাবতে ভাবতে ভাবনার অতলে হারিয়ে যাবেন ভোটদাতা।

৫. যাবতীয় ভাবনার মধ্যে নিমজ্জিত থেকে ভোটদাতা এরপর আচমকা একটা রাজনৈতিক দলের কথা ভাববেন। মানে, ভোটদাতার অবচেতন মনে যে দলটার নাম আসবে সেটার কথা ভাববেন। এতেই ভোট দেওয়া হয়ে যাবে।

আকমল সাহেবের দাঁতকপাটি লেগে যাওয়ার অবস্থা। ভাতিজা উরুহু তাকে মুখে সব বুঝিয়ে বলল। তাতেও মাথায় কিছু ঢুকলো না। এদিকে ভোট তাকে দিতেই হবে। তা না হলে ভোট আইনে মামলা হবে। জরিমানা হবে।

নির্দেশনা পড়ে আকমল সাহেব একটা জিনিস ভেবে পেলেন না। এভাবে যদি ভোটারকে ভাবনার সাগরে ডুবে যেতে হয়, তবে যন্ত্রপাতির কী দরকার। ভেবেচিন্তে শেষে একটা বাটন চেপেই তো ভোট দেওয়া যায়।

পরদিন ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেল। ভোট দেওয়ার এখনো ঘণ্টা পাঁচেক বাকি। তাড়াতাড়ি রুটিনমাফিক নিজের মাথাযোগ একাউন্ট খুললেন আকমল সাহেব। একটা পোস্ট দেখে কুঁচকে গেল ভ্রূজোড়া।

‘মগোজ আপনার মগজ চুরি করবে না তো?’

মগোজ সিস্টেমের ব্যাপক সমালোচনা করা হয়েছে পোস্টটাতে। যার অনেক কিছুই আকমল সাহেব বুঝতে পারলেন না। সারকথা হলো, মগোজ সিস্টেমে নাকি কার মাথায় কী আছে, দেশ নিয়ে কে কী ভাবছে সমস্ত তথ্য চলে যাবে কেন্দ্রীয় সার্ভারে। ইতিমধ্যে যারা ভোট দিয়ে ফেলেছেন তাদের মাঝে কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। কারণ

মগোজ-এর জাল-টুপি পরার পর নাকি তারা দেশদ্রোহী চিন্তাও করেছিল। উচিৎ শিক্ষা হয়েছে! ভাবলেন আকমল সাহেব। আবার কয়েকজন নাকি দেশের উন্নয়ন নিয়ে ভাবতে গিয়ে বড় বড় আমলাদের দুর্নিতী নিয়ে এতই খারাপ ভাবনা ভেবেছে যে তাদের বিরুদ্ধে কোটি টাকার মানহানীর মামলা হয়ে গেছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে।

আকমল সাহেব ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। এদিকে তার হাতে পরানো ব্যান্ডটা সংকেত দিচ্ছে, ভোট দেওয়ার আর চার ঘণ্টা বাকি। আকমল সাহেব কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। দেশ নিয়ে ভালো ভালো চিন্তাগুলোর দিকে ফোকাস করার চেষ্টা করছেন মনটাকে। কিন্তু পারছেন না। প্রযুক্তিতে কত এগিয়ে গেছেন তারা। কিন্তু এটা ভাবতে গেলেই আবার একদল দুর্নীতিবাজের মুখ ভেসে আসছে বারবার। 'কী মুসিবতে পড়লাম রে বাবা। ভাবনা কন্ট্রোল করি কেমনে!'

এদিকে সময় চলে যাচ্ছে দ্রুত। আকমল সাহেব গোসল করলেন, খেলেন। শুয়ে বিশ্রামও নিলেন। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা হচ্ছে না।

'আপনার ভোট দেওয়ার মাত্র এক ঘণ্টা বাকি। এর মধ্যে ভোট না দিলে আপনার নগদ দশ লাখ টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে.. ।'

আকমল সাহেব ঘামতে শুরু করলেন। বুড়ো হয়েও নিস্তার নেই তার। মগোজ-এর নিচে দাঁড়াতেই হবে। আচমকা ফোন আসতেই চমকে উঠলেন।

‘উরুহুরে এসব কী শুনছি! মগোজ নাকি মগজের সব তথ্য পাচার করে দিচ্ছে?’

‘দাদু, তুমি আসল খবরই শুনো নাই! ঘটনা ঘটে গেছে!

‘কী ঘটনা!’

‘আরে পোলাপাইন কি কম শয়তান? তাদের মগজের তথ্য হ্যাক করা এত সহজ!’

‘ঘটনা খুলে বল।’

‘পোলাপাইন মগোজ-এর নিচে দাঁড়িয়ে সব কিছু বাদ দিয়ে হার্ড রক, মেটাল গান থেকে শুরু করে একশ বছর আগের রবীন্দ্রসঙ্গীত ভাবছে। পটল দিয়ে পায়েস রান্নার রেসিপি থেকে ডি পাস প্রগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, মহাকাশ থেকে শুরু করে করিমগঞ্জের বিখ্যাত হালুয়া; সব একসঙ্গ ভাবতে শুরু করছে। তাদের চিন্তা বিশেষণ করতে গিয়া মগোজ-এর প্রসেসরে এমন প্যাঁচ লাগসে যে ভোট তো দূরের কথা অনেক মেশিনই নষ্ট হয়ে গেছে। এর মধ্যে আবার কে যেন একটা চিন্তা ভাইরাস সেন্ট্রাল সার্ভারে ছেড়ে দিয়েছে। পাবলিকের মাথা থেকে চুরি করা সব তথ্য মুছে দেবে ওটা। আপাতত এই সিস্টেম বাতিল। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো।’

আকমল সাহেবের মনে হলো তার মগজটা এখন জলের মতো সুস্থির। কী নির্মল কুল কুল শব্দ শুনতে পাচ্ছেন কল্পনায়। অথচ দুই মিনিট আগেও কত টেনশনে ছিলেন। এমন সময় হাতের ব্যান্ডটা ভাঙা ভাঙা যান্ত্রিক শব্দে বলে উঠলো, ‘আপনার.. ভোট... দেওয়ার.. আর মাত্র.. বাকি.. আছে... দুই লক্ষ ঊননব্বই হাজার আশি ঘণ্টা... তেত্রিশ মিনিট...।’

বৈশাখ ২০১৯

মধ্যবয়সী আকালু ছোটখাট চাকরি করেন। চাকরি ছোট হলেও কোম্পানি বিশাল বড়। চিকন বুদ্ধিওয়ালা রোবট বানায়। এতে লাভ বেশি। এ কারণে পহেলা বৈশাখের বোনাসও দেয়। যদিও আকালু পহেলা বৈশাখের বিষয়টি ঠিক ধরতে পারেন না। বাংলা ক্যালেন্ডারে দুনিয়া তো দূরে থাক তার নিজের দেশই চলে না, সেখানে এই ক্যালেন্ডারের এক তারিখে বোনাস পাওয়ার যুক্তি নাই। সেই হিসাবে পহেলা জানুয়ারিতে ডাবল বোনাস দেওয়া উচিৎ।

অবশ্য ১ জানুয়ারি ছুটি না থাকলেও ১ বৈশাখ আকালুর ছুটি। এটাই বড় কথা। কিন্তু এই ২০১৯ বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখে তিনি কী করবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। এদিন সবাই করেটা কী? ইতিহাস কী বলে? এত পুরনো ইতিহাস ঘাঁটতে গেলে এক মাস লেগে যাবে। আকালু শুধু জানেন, পহেলা বৈশাখের দিন সকালে একটা বড় ছাদে সবাই একত্র হয়ে বিশাল এক বাঁশি বাজায়। যার বাঁশিতে কান যত ঝালাপালা হবে সে হবে বিজয়ী। তাকে হাইড্রো-কার্বনের একটি বিশেষ অর্গানিক স্যুপ খেতে দেওয়া হবে। সঙ্গে থাকবে কারখানায় তৈরি সিলিয়ান মাছের ফ্লেভার। নদীনালায় সিলিয়ান মাছ আজকাল পাওয়া যায় না বললেই চলে। চাষের সিলিয়ান নিয়েও সে কি হইচই। কলাম লেখকরা এ সময় কোমর বেঁধে নেমে বলেন, এভাবে সিলিয়ান খেলে একদিন বাংলার ছাদের

টাংকিগুলো সব সিলিয়ানশূন্য হয়ে যাবে। পহেলা বৈশাখের সঙ্গে সিলিয়ান মাছের সম্পর্ক কোনো কালেই ছিল না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আকালু নিজেও ঠিক জানেন না বাঙালি পহেলা বৈশাখের সঙ্গে আর কীসের সম্পর্ক আছে বা ছিল।

আজ আকালুর স্ত্রীরও অফিস ছুটি। সে আর দশ বছরের ছেলে নিমিন সাতসকালে তৈরি হচ্ছে পহেলা বৈশাখ পালন করবে বলে। শহরের উড়াল সেকশনের বিশ নম্বর ব্লকে থাকেন তারা। নিচে নামতে গেলে হোভারক্রাফট ভাড়া করতে হয়। আকালুর চিন্তা হলো, খায়াদায়া কাম নাই, আবার বাড়তি খরচ।

'আইজকা তো হোভারও পামু না।'

'আজ কেউ গাড়িগোড়ায় চড়বে না। আজ আমরা প্যারাশুট দিয়ে লাফ দেব। সোজা গিয়ে নামবো ঢাকা আন্তঃগ্যালাক্টিক বিদ্যালয়ে (ঢাআবি)। গ্যালাক্সির অন্যান্য প্রাণীরা আজ আমাদের হণ্টনে অংশ নেবে। তুমি প্যারাশুটের ইঞ্জিনটা চেক করে দাও।'

স্ত্রীর কথায় হাঁফ ছাড়লেন আকালু। যাক, খরচ বাঁচল। নিমিনের দিকে তাকালেন। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। এই বয়সেই পেকে একাকার। আকালু ছোট থাকতে এত চঞ্চল ছিলেন না। বাবার কোল্ড ফিউশন মোটর সাইকেলটা চুরি করে একবার শুধু বাড়ি ছেড়ে হিমালয়ে গিয়েছিলেন পাহাড় আর বরফ দেখবেন বলে। গোটা দুনিয়ার আর কোথাও বরফ টরফ নাই। সব গলে শেষ।

'বাবা আমি বৈশাখের ইতিহাস বের করেছি। চার-পাঁচ শ বছর আগে বাঙালিরা পান্তা নামে একটা জিনিস খেত।

ভাতের সঙ্গে এইচ-টু-ওর রাসায়নিক বিক্রিয়া করে বানানো হতো ওটা। সঙ্গে নানা রকম মাছ থাকত। এর মধ্যে ইলিশ নামের একটা নবম মাত্রার মাছ ছিল বেশি জনপ্রিয়। ওগুলোর একটাও এখন নেই বাবা। আর ভালো কথা, এই মেলা জিনিসটা কী? তুমি কখনো মেলায় গিয়েছিলে? আমার ইচ্ছে হচ্ছে এসব আবার নতুন করে বানাই।'

'তোর যা খুশি বানা বাবা। মেলা টেলা কী জিনিস তোর দাদাও জানে না। তুই জানবি কী করে।'

'আমি আরো পেছনের ইতিহাস নিয়ে পড়ছি বাবা। অনেক মজা হতো পহেলা বৈশাখে।'

কথা না বাড়িয়ে আকালু তার পরিবার সমেত প্যারাশুট দিয়ে ঝাঁপ দিলেন শহরের গ্রাউন্ড সেকশনে। নিচে গাদা গাদা বাড়ি। একটা আরেকটার সঙ্গে একেবারে লাগোয়া। ছাদে রেলিং-বিরোধী আইন পাশ হওয়ায় ভালোই হয়েছে। ছাদের সঙ্গে ছাদ জুড়ে তৈরি হয়েছে বিশাল মাঠ। এমন একটা মাঠে আয়োজিত হচ্ছে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান। ঢাআবির ক্যাম্পাসের ছাদে লোকে গিজ গিজ করছে। ছাদের নিচে খানিকটা দূরে সংরক্ষিত গাছ সেকশন। সেখানে কারো প্রবেশাধিকার নেই। আকালুর ইচ্ছে হলো ওই ঘন গাছের রাজ্যে গিয়ে নামতে। অনুষ্ঠানে তার মন নেই। গাছ তাকে ছোটবেলা থেকেই টানে।

নিমিন তার খুদে কলাইডর যন্ত্র টিপাটিপি করতে ব্যস্ত। ইলেকট্রন প্রোটন সাজিয়ে সারাক্ষণই এটা ওটা বানায়। বাতাস থেকে বিভিন্ন অণু পরমাণু মিক্স করে মজার মজার সব

খাবারও বানাতে পারে ও। প্রিন্টার দিয়ে সেই খাবার বা বস্তু চলে আসে হাতে।

ছাদে নামতেই গুগল! বলে চিৎকার করে উঠলো নিমিনি। এত খুশি হওয়ার কারণ কী?

'বাবা আমি পহেলা বৈশাখের ঐতিহ্য আবিষ্কার করেছি! প্রায় ৬০০ বছর আগের ঐতিহ্য। আমাদের মহান গুগলের সর্বশেষ ডাটাবেজে যেটা ছিল সেটা। আমি একটা স্টল দেব এখানে। মানুষকে ৬০০ বছর আগের পহেলা বৈশাখ খাওয়াব, মানে চেনাব।

নিমিন দ্রুত তার কোয়ান্টাম ফোনে আবেদন করে স্টল পেয়ে গেল। ছাদের এক কোণে রোবটের দল এক মিনিটেই সাজিয়ে দিল সব। নিমিন তাতে একটার পর একটা খাবার প্রিন্ট করছে। ডিসপ্লেতে ভেসে ওঠা লেখাটা দেখে উপস্থিত জনতার চোখ কুঁচকে গেল, 'পান্তা! হোয়াট ইজ দিস? সঙ্গে আবার ইলিশ, পুঁটি, পাবদা ফ্লেভারের প্রিন্টেড মাছ।'

'আসল বৈশাখী খাবার খেতে আসুন জনগণ। পান্তা ছাড়া বৈশাখ হয় না। আর এটা হলো আমার বানানো বিশুদ্ধ অর্গানিক পান্তা। আপনাদের দাদার দাদাও যেটা খায়নি।' আকালু ছেলের কাণ্ড দেখে বিরক্ত হলেন না। উৎসব বলে কথা। মজা করুক।

এদিকে আকালু তার স্ত্রী ও নিমিনিকে ছাদে রেখে নিজে চট করে নেমে পড়লেন গাছের সংরক্ষিত জোনে। ছোটবেলা থেকেই নিরাপত্তা বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিতে ওস্তাদ তিনি। অজানা অচেনা সব বৃক্ষ। এগুলো তাকে বরাবরই টানে। তাই আইন ভেঙে ঢুকে পড়লেন জঙ্গলে। আগেকার মানুষজন

এসব গাছের নামটাম জানতো। তারও হঠাৎ ইচ্ছে হলো গাছের নাম জানার। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ বুঝতে পারলে পথ হারিয়েছেন। পকেটে কোনো যন্ত্রপাতিও নেই যে পথ চিনবেন। একটা বিশাল বড় গাছের নিচে এসে দাঁড়ালেন আকালু। গাছ থেকে অদ্ভুত কিসিমের লতা নেমে এসেছে। গাছেরও তা হলে দাড়ি গজায়।

আচমকা একটা গলা শুনে লাফিয়ে উঠলেন আকালু। 'ভাই, দেখেন! প্রাণভরে দেখেন। এর নাম বটগাছ। জায়গার নাম রমনা। এটাই সেই রমনার বটমূল। একটু পর নিরাপত্তা কমিটি এসে ধরবে আমাদের। অবশ্য চিন্তা নাই। মাত্র দুই ইউনিট জরিমানা করবে। কিন্তু সবার কপালে তো আর এ জায়গা দেখার সৌভাগ্য হয় না।'

'আপনে জানেন কেমনে?'

'আমি ইতিহাসে অবডি (অনেক বড় ডিগ্রি) করেছি। খুব বেশি লোকে এসব জানে না। ছয় শ বছর আগে এখানেই লোকে জড়ো হয়ে বৈশাখের দিন নাচগান করতো। কী দারুণ ব্যাপার, তাই না! কোনো অনুভূতি পাচ্ছেন মশাই!'

আকালু লজ্জায় পড়ে গেলেন। তার গাছগাছড়া ভালো লাগে ঠিকই। বিশেষ কোনো অনুভূতি টের পেলেন না। তবে একটা প্রশ্ন করার জন্য গলাটা উশখুশ করছে। থাকতে না পেরে করেই ফেললেন, 'ইয়ে জনাব, এই নাচগান বিষয়টা কী?'

ভবিষ্যতের রাশিফল

নৈসর্গিক রাশিচক্রে মিল্কি ওয়ের ৬৫৪৬-সি-৯ ব্ল্যাকহোল এ বছর ধনুতে অবস্থান করছে। এ বছর পৃথিবীবাসীর ওপর ক্রিপটোনাইট গ্রহের প্রভাব থাকবে।

মেষ: হোভার ক্রাফটে ভ্রমণ করা থেকে বিরত থাকুন। আজ আপনার প্রেমিক/প্রেমিকার মস্তিষ্কে পজিটোলাইটিং কণার আধিক্য থাকবে। বেশি ঘাঁটাবেন না। স্বাস্থ্যের জন্য পিকোবাইট জেলি খেতে পারেন। শুভ সংখ্যা: (১০.১২)[৬৫]

বৃষ: গ্যালাক্সি ভ্রমণ শুভ। অ্যান্ড্রোমিডার ক্রিপটন গ্রহের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। পৃথিবীর বাইরে না যাওয়াই মঙ্গল। সংখ্যা: (ই * ০.০২৫)[লগ ৫]

মিথুন: ক্রায়োজেনিক সবজির ব্যবসায় হাত দিতে পারেন। গ্যালাক্টিক সম্পর্ক অনুকূলে। এলিয়েনের সঙ্গে বিবাদের আশংকা। ভিন্ন জিনেটিক প্রোফাইলের কারো সঙ্গে মন দেওয়া নেওয়া না করাই উত্তম। সংখ্যা: মিল্কি ওয়ের নক্ষত্র সংখ্যা * ক্রাইটনের পারমাণবিক ভর।

কর্কট: জটিল প্রকৃতির রাশি হওয়ায় চলতি সপ্তাহ আপনার মিশ্র ওজনে কাটিবে। অর্থাৎ বিভিন্ন মাত্রার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির গ্রহে যাতায়াতের প্রকট সম্ভাবনা। নতুন ভাইরাস থেকে

সাবধান! পকেটে আল্ট্রা-মেডিক রাখবেন। মহাকাশে পুরনো প্রেমিকার সাক্ষাৎ লাভের সম্ভাবনা। শুভ সংখ্যা: +-ই (মহাজাগতিক সকল সংখ্যা)

সিংহ: অন্য গ্যালাক্সির সম্পত্তি নিয়ে কলহ দেখা দিতে পারে। পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রাখতে ব্রেইন সিম্যুলেশন-৫৪ ব্যবহার করুন। অ্যান্ড্রোমিডা স্টক এক্সচেঞ্জে বিনিয়োগ না করাই ভাল। সংখ্যা: হিগস বোসনের ভর।

কন্যা: দূরবর্তী নক্ষত্র থেকে ভাল সংবাদ পাবেন। দাম্পত্য সম্পর্কে পালসার নক্ষত্রের তরঙ্গ আঘাত হানতে পারে। হাইব্রিড রেঁয়াজের (রসুন+পেঁয়াজ) ব্যবসা শুভ। নারীদের জন্য ডার্ক ম্যাটারের অলংকার উত্তম। সংখ্যা: ৩২ কোয়াজিলিয়ন (যা গুনে শেষ করা যায় না)

তুলা: সপ্তাহ জুড়ে ভর নির্ণায়ক গ্রহ ক্লাডোসের ওপর সৌরঝড় বিদ্যমান। স্পেসশিপে ভ্রমণকালে অতিরিক্ত অ্যান্টি-নিউট্রিনো শিল্ড সঙ্গে রাখিবেন। বাসার কাজের রোবটের সঙ্গে বিবাদে জড়াবেন না। শুভ সংখ্যা: এক হ্যাঁচকাবাইট (এক-এর পর এক কোটি কোটি কোটি শূন্য)

বৃশ্চিক: অপেক্ষাকৃত শীতল কোনো গ্রহে বিনিয়োগ শুভ। নতুন একটা হৃৎপিণ্ডের অর্ডার দিয়ে রাখুন। মস্তিষ্কের ডান অলিন্দে অতিবেগুণী রশ্মির প্রভাব লক্ষ্যণীয়। হাঁটাচলায় সাড়ে নয় মাত্রার রোবটের সাহায্য নিন। সংখ্যা: শূন্যের সবচেয়ে

কাছের সংখ্যা।

ধনু: আজ কোনো এলিয়েনের সাক্ষাৎ পেতে পারেন। কথাবার্তায় সাবধানী হবেন। ইন্টার-গ্যালাক্টিক লেনদেনে জড়ানো থেকে বিরত থাকুন। বিপদ এড়াতে ইউরেনাসে প্রাপ্ত টাইটানিয়ক্সাইডাস পাথর পরতে পারেন। সংখ্যা: ০.০+০/০?

মকর: মাঝপথে স্পেসশিপের জ্বালানি ফুরাবার আশংকা প্রকট। পথে ভিনগ্রহের বন্ধুর দেখা পাবেন। একশ বত্রিশতম মৌলিক পদার্থ হাবুডাস্টিংয়ের আংটি পরিধানে শুভ পরিণতি। সংখ্যা: ক্রাটুস গ্যালাক্সির মোট পরমাণু সংখ্যা।

কুম্ভ: প্রেমের বিয়েতে গ্যালাক্টিক ভালবাসা কমিটির সম্মতি মিলতে পারে। পরিবারের সঙ্গে হাকুলাক্স গ্রহে ভ্রমণ করুন। ব্রেনবুকে এলিয়েনের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাবেন। একসেপ্ট করলে সম্পদ প্রাপ্তির উজ্জ্বল সম্ভাবনা।
শুভ সংখ্যা: এখনো আবিষ্কার হয় নাই এমন সংখ্যা।

মীন: চলতি সপ্তাহ স্টেমসেল হইতে প্রক্রিয়াজাত মাংস খাওয়া ঠিক হবে না। বেশি করে জিএম-৪৫৬৫ ফলের জুস খেতে হতে পারে। হাবাং গ্যালাক্সিতে ভ্রমণ শুভ। যে কোনো ধরনের রোবট ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
সংখ্যা: পাইয়ের মতো দেখতে সদ্য আবিষ্কৃত মহাজাগতিক ধ্রুবক ‘নাই’।

দবিরউদ্দিন ও থ্রিডি সিনেমা

তালপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান দবিরউদ্দিন সাহেব ঢাকায় এসেছেন সিনেমা দেখতে। নিজের গরজে আসেননাই। শহরে তার দুই মেয়ে পড়াশোনা করে। মেয়েদের শখ বাবাকে হলে নিয়ে সিনেমা দেখাবে। যেনতেন সিনেমা নয়, থ্রিডি সিনেমা। অনেক দিন ধরে ঘ্যান ঘ্যান। বাবা আসো তোমারে থ্রিডি মুভি দেখাই। দবিরউদ্দিন যুবক বয়সে হলে যথেষ্ট সিনেমা দেখেছেন। সিনেমা দেখাটা তার কাছে বিশেষ কিছু নয়। রাজ্জাক কবরী থেকে হালের শাকিব খানকেও চেনেন। কিন্তু মেয়েদের ঘ্যানঘানানি শেষে বিরক্ত হয়ে গেলেন বিদেশি সিনেমা দেখতে। আসলে মেয়েরা বাবা বলতে অজ্ঞান। আহ্লাদ নামের অত্যাচারটা তাই মুখ বুজে সহ্য করেন দবিরউদ্দিন।

'এই থিরিডি বইয়ের নায়ক নায়িকা কে?'

দবিরউদ্দিন পুরানা আমলের লোক। সিনেমাকে এখনও বই বলে ডাকেন। বড় মেয়ে বুঝিয়ে দিল, 'আসলে বাবা তোমারে কাহিনী দেখতে হবে না। তুমি শুধু দেখবে কেমন লাগে। সব দেখবে কাছে কাছে। একেবারে আসলের মতো। উফফ.. তুমি বুঝবে না। আগে দেখইতো!'

দবিরউদ্দিন দ্বিতীয় দফায় অবাক হলেন যখন দেখলেন সিনেমা দেখতে হবে চোখে সানগ্লাস পরে। 'ওহ, না বাবা! এটা স্পেশাল থ্রিডি গ্লাস। সানগ্লাস না।'

যাই হোক, সিনেমা শুরু। দবিরউদ্দিনের দিকে দুপাশ থেকে

তাকিয়ে আছে তার দুই মেয়ে। একটু পর ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠতে লাগলেন দবিরউদ্দিন। সিনেমা দেখে মাথা ঘোরার দশা। দুই নভোচারী আটকা পড়েছে মহাকাশে। নাটবল্টু সব উড়ে বেড়াচ্ছে। মানুষও উড়ে বেড়াচ্ছে। নিচে বিশাল পৃথিবী। মহাকাশযানের নাটবল্টু উড়ে এসে দর্শকদের মাথার ওপর চলে আসছে। দবিরউদ্দিন দুইবার হাত বাড়িয়ে কী যেন ধরতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের ধমক, 'উফ বাবা! এটা থ্রিডি সিনেমা। তাই মনে হবে সব কিছু কাছে কাছে কিন্তু আসলে নেই। এই ফাঁকিটাই মজা।' দ্বিতীয় ভুলটা করলেন শব্দ নিয়ে। পেছন থেকে মনে হলো কে যেন কথা বললো। তিনি পেছন ফিরে তাকালেন। আবারও মেয়েদের ধমক। 'বাবা, এটা সারাউন্ড সাউন্ড। মনে হবে সব দিক দিয়েই শোনা যাবে।'

দবিরউদ্দিনের হাত পা ছোড়াছুড়ি বন্ধ হলো। খানিক পর ভন ভন ভন। একটা মশা। সারাউন্ড সাউন্ড করতে করতে এগিয়ে আসছে। 'বাহ, পুরাই বাস্তব দেখতেসি!' মশাটা দবিরউদ্দিনের নাকের ডগায় বসলো। দবিরউদ্দিন আগের মতো আর হাত ঝাপটা মারলেন না। মুগ্ধ হয়ে থ্রিডি মশা দেখতে লাগলেন। খানিকটা খটকাও লাগলো। মহাকাশে মশা আসলো কোত্থেকে। কামড় দেওয়ার পরও তার ইচ্ছে হলো না মশাটাকে তাড়িয়ে দেওয়ার। 'সিনেমায় কত কিসু হয়' এইরকম ভাবতে ভাবতে এক সময় শেষ হলো সিনেমা। হল থেকে বের হয়েই ঝিম মেরে রইলেন দবিরউদ্দিন। মেয়েরা মজা করে ভাজা মুরগি আর আলু খেলেও তিনি কিছু খেলেন না। শুধু এদিক ওদিক কী যেন খুঁজে ফেরেন। হাতের কাছে

দেয়াল থাকলে ছুঁয়ে দেখছেন। এভাবেই শেষ হলো দবিরউদ্দিনের ঢাকা সফর। ফিরে গেলেন তালপুরে। দিনের বেশিরভাগ সময় ঝিম মেরে বসে রইলেন। ভাবতে ভাবতে বেলা গড়ায়।

গ্রামের পথে বের হলেন দবিরউদ্দিন। সবই অন্যরকম লাগে। চারপাশে কত কিছু। 'বেবাক কিছু দেখতেসি থিরিডি। আহারে ছাগলটা এদিকে আসতেসে। আমার দিকে আসতেসে। আয় আয়। একি হারু মাঝি দেখি! সেও দেখি কাছে আসতেসে। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ভাল আছি। তুমি কেমন আছো? ভালো? তোমার আর আমার মাঝে এতদিন দূরত্ব আছে মনে করতাম, এখন মনে হইতেসে সব কিসুই থিরিডি। দূরত্ব বলে আসলে কিসু নাইক্কা। দূরত্ব মানে ফাঁকি। কাছে আসো হারু মাঝি।'

দবিরউদ্দিনের একটা কিছু হয়েছে, সম্ভবত সেটা কোনো ওঝা বা দরবেশই ভাল বলতে পারবে, গ্রামবাসী এমনটা ভেবে ভেবে একসময় দবিরউদ্দিনকে অবাঞ্চিত ঘোষণা করে দিল। দবিরউদ্দিন নাকি সবার কাছে কাছে ঘুর ঘুর করেন। মানুষে মানুষে দূরত্ব দূর করার কথা বলেন। গ্রামের গণ্যমান্যরা বিষয়টা ভাল চোখে দেখলেন না। তাদের কথা হলো পাড়ার বদু মুচি আর তারা এক হতে পারেন না। দবিরউদ্দিন কেন যে তাকে বুকে জড়াইয়া ধরলো, এটা নিয়ে তারা মিটিং ফিটিং করে হুলুস্থুল। একসময় দবিরউদ্দিনের চেয়ারম্যানগিরি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়। অবধারিতভাবে তার কন্যারা তাকে ঢাকায় নিয়ে যায়। চিকিৎসার জন্য। ডাক্তার বুঝতে পারেন না দবিরউদ্দিনের সমস্যা। 'আসলে ধরেন, আমরা সবাই কত

কাছে কাছে। এই যে আমি আপনি। অথচ আপনি ভাবতেসেন যে আমি আপনার অনেক দূরে। আপনি ভাবতেসেন আমি একটা পাগল আর আপনি ভালো। আপনি মনে করতেসেন এইটা একটা থিরিডি সিনেমা। এই যে কাছে আসাটা, এইটা একটা ফাঁকি। আসলে তা না, কাছে আসাটাই বড় কথা। আমরা সবাই সবার যত কাছে আসবো, তত মজা। ততই মনে হইবো সব থিরিডি হইয়া গেছে।'
ডাক্তারের চেম্বার থেকে বের হয়ে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে উপদেশ দেওয়ার মতো মুখ করে দবিরউদ্দিন বললেন, 'সিনেমা হলে কোনো কিছু কাছে চইলা আসলে তোমরা যেরকম খুশি হও, বাস্তবে কেউ কাছে চইলা আসলেও খুশি হইবা। জীবনে হাসি আনন্দ চাইলে মানুষকে কাছে টানবা, সবাই কাছাকাছি থাকবা। জীবনটারে থিরিডি সিনেমা বানাইয়া ফেলবা, বুঝলা?'
'বুঝছি আব্বা। আপাতত এইটা পর।'
উদাস মুখ করে চশমাটা পরে নিলেন দবিরউদ্দিন। কালো চশমা। থ্রিডি মুভির চশমা না। সাধারণ সান গ্লাস। ডাক্তার অনেক ভেবেচিন্তে বলেছেন কিছুদিন এটা পরে থাকুক। থ্রিডি ভাব কেটে যাবে!

ভালবাসা বিষয়ক গরুর রচনা

ভালোবাসা একটি গৃহপালিত বস্তু। এর সব কিছুতেই দুটি দুটি। এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দেওয়ার জন্য ভালোবাসার দুটি কান আছে। তবে সারা দিন দুজন একসঙ্গে হাঁটাচলা করে বিধায় এর পা আছে চারটি।

ভালোবাসার একটি অদৃশ্য লেজ আছে। যাবতীয় নিন্দুক মশা-মাছি তাড়াতে সেই লেজের জুড়ি নেই। তথাপি ভালোবাসাটাকে বিশ্বাসের খুঁটিতে বেঁধে রাখতেই হয়। তা না হলে দড়ি ছিঁড়ে ভালোবাসা ছুটে গিয়ে কার ক্ষেতের ধান খেয়ে ফেলবে তার ঠিক নেই।

অর্থনীতিতে ভালোবাসার অবদানের কথা বলে শেষ করা যাবে না। সারা দুনিয়ায় কোটি কোটি টাকার ফুল আর চকোলেট কেনাবেচা হয় এই ভালোবাসার কারণে। এর আগাগোড়া সব কিছুই বেচা যায়। ভালোবাসার ডেটিং নামক খাতে অনেক টাকা আয় করে নেন চটপটি, ফুচকা, উপহার, ফুল ও টক টাইম বিক্রেতারা। ভালোবাসার গভীরে গেলে বিক্রি হয় গয়নাগাটি, শাড়ি, কসমেটিকস। আরো গভীরে গেলে বিক্রি হয় ডায়াপার, বেবি অয়েল, বেবি ফুড, খেলনা ইত্যাদি।

ভালোবাসার জন্য ভালো একটা গ্যাস-বিদ্যুৎ সংযোগওয়ালা গোয়ালঘরও লাগে। সেখানে গাই ও গরুর মতো স্বামী-স্ত্রী নিরাপদে বাঁধা থাকে। গরুকুলের মাঝে কেউ কেউ ষাঁড় হওয়ার চেষ্টা চালালেও অনেককে বলদ হতে হয়। বলদ দিয়ে খুব ভালো হালচাষ হয়। বলদ একটি উপকারী প্রাণী। কোরবানির ঈদে এদের কদরও থাকে বেশি।

ভালোবাসার সঙ্গে গরুর সম্পর্ক বহুকালের। প্রেম হারানো মানুষকে আমরা বেচারা গরু বলি। মানে গোবেচারা। আবার প্রেম বেশি গাঢ় হলে একে অন্যকে ও-গো, হ্যাঁ-গো বলে ডাকতে শোনা যায়। প্রেমের ডাকে গো একটি অত্যাবশ্যকীয় শব্দ। (উদাহরণ : কোথায় যাচ্ছ গো...এমন করো না গো)। আবার প্রেমের উল্টোটা ঘটলেও গরুর সাহায্য নিতে হয়। ভালোবাসার এক পক্ষ প্রবল রেগে গেলে অন্য পক্ষকে চিৎকার করে বলে, 'জাস্ট গো!'

ভালোবাসায় রাগারাগি বা হিংসা-বিদ্বেষ নেই। যেটা আছে সেটা হলো অভিমান ওরফে গোসসা। আর সেই গোসসা ভাঙাতেও দেখা যায় প্রেমিক-প্রেমিকারা একে অন্যকে লাল গো-লাপ দিচ্ছে।

একমাত্র গরু হারালেই লোকে বউকে ভুল করে মা ডেকে ফেলে (প্রবাদ : গরু হারালে এমনই হয় মা)। আবার ঘর ভেঙেছে এমন গরু ওরফে স্বামী অন্য কারো স্ত্রীকে দেখলেও ভয় পায়। এখান থেকেই প্রবাদ এসেছে, ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। বলে রাখা ভালো, ভালোবাসা হারিয়ে গেলে লোকে সেটাকে আবার গরুখোঁজা খোঁজে। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই আর ভালোবাসা খুঁজে পাওয়া যায় না।

ভালোবাসা কী খায়? উত্তর : ঘাস। পার্কে গেলে আমরা দেখতে পাব দুজনই একটা একটা করে ঘাসের ডগা ছেঁড়ে। এরপর দাঁত দিয়ে কুটি কুটি করে সেই ঘাসে কামড় দেয়। এ ছাড়া আরো কিছু কারণে ভালোবাসা খাদ্যাভাব দূর করতে সক্ষম। কারণ ভালোবাসাবাসির সময় খিদা লাগে কম।

নাওয়ার কথা না ভুললেও খাওয়ার কথা ভুলে অনেকে। আবার ফোনে কথা বলতে বলতেও বেলা গড়িয়ে যায়।

ভালোবাসার উপকারিতা অনেক। তবে গরুর মতো এটাকেও যদি কৃত্রিম উপকরণ ও নানা উপহার সামগ্রী দিয়ে মোটাতাজাকরণের চেষ্টা করা হয়, তবে আখেরে ফল সুস্বাদু হয় না। এতে ভালোবাসা অকালে মারাও যেতে পারে। আর এ জন্য যারা ঘন ঘন কৃত্রিম প্রেম প্রদর্শন করে ভালোবাসা দ্রুত মোটাতাজা করতে চায়, তাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই উত্তম। প্রবাদে আছে দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য মন ভালো।